ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2317-2340
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.495

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ: একটি গবেষণা মূলক সাহিত্য বিশ্লেষণ

ঐন্দ্রিলা আইচ, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2026; Accepted: 28.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Paṇḍit Śrîjîb Nyāyatiîrtha is a distinguished name in the realms of Sanskrit literature. His literary oeuvre is primarily shaped by a synthesis of Sanskrit drama, farce, poetry, and social consciousness. While adhering to classical dramatic traditions, he has given literary expression to contemporary life issues, human values, social inequalities, moral degradation, and various facets of national consciousness. A unique blend of tradition and modernity is evident in his writings. His satirical perspective, artistic use of language, and profound observation of human life—particularly in his contemporary problem-oriented farces and plays—have earned him a unique stature. This research study analyzes the thematic content, artistic style, social consciousness, and philosophical aspects of Śrîjîb Nyāyatiîrtha's literary works. His writings reflect not merely entertainment but also an educational and thought-provoking perspective. Therefore, he is regarded as a significant figure in modern Sanskrit literature. The research paper under discussion attempts to evaluate his literary contributions and determine his position within the tradition of Sanskrit drama.

Keywords: Śrîjîb Nyāyatiîrtha, Literary pursuits, Sanskrit-farce, Human values, social consciousness, Satire and humor, writing style

বিংশ শতকের বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ও সাহিত্যস্রষ্টা রূপে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ স্বীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল ছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন ও সাহিত্যকীর্তি আধুনিক জনজীবনে বেশ প্রাসঙ্গিক। এই সংস্কৃত-সাহিত্যিক ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী), বুধবার, শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথির প্রত্যুষে (৩টে ৩০ মিনিটে) তিনি জন্মলাভ করেন[১] এবং ১৯৯২ সালের ২৮শে অক্টোবর শতায়ু তাঁর জীবনপ্রদীপ চিরনির্বাপিত হয়।

শ্রীজীবের পরিচয়:

ভট্টপল্লী রত্নস্বরূপ[২] জাতীয়তাবাদী আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন ছিলেন প্রবাদপ্রতিম পণ্ডিতজন। তাঁরই গৃহ আলো করে তৎ-পিতৃবংশ ও বিদ্যাবংশের সুযোগ্য উত্তরসূরী শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের ২৪পরগণা জেলার নৈহাটির নিকটস্থ ভাটপাড়া নামক স্থানে তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র রূপে জন্মলাভ করেন।[৩] শ্রীজীব ছিলেন আচার্য পঞ্চানন ও কুসুমকুমারী দেবীর একমাত্র পুত্রসন্তান; নন্দলাল বিদ্যারত্ন ও শশীমুখী দেবীর পৌত্র এবং লম্বোদর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য প্রপৌত্র। তাঁর (শ্রীজীবের) বংশের ঊর্ধতন পুরুষ শঙ্খভট্ট ছিলেন প্রসিদ্ধ

বৈয়াকরণ।[৪] তাঁর পুত্রের নাম-গণপতি ভট্ট; গণপতি ভট্টের পুত্র গোবিন্দানন্দ হলেন কবি কঙ্কনাচার্যের পূর্বসূরী; যিনি বাংলার স্মৃতি সংগ্রাহকদের আদিপুরুষ রূপে প্রসিদ্ধ। গোবিন্দানন্দের অপর ভ্রাতা ছিলেন অল্লাল ভট্ট, যিনি যশোহরের ধুলিয়াপুরের সিদ্ধপুরুষ হিসাবে খ্যাত ছিলেন। এই অল্লাল ভট্টের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ হলেন শ্রী শ্রীজীব ভট্টাচার্য মহাশয়।[৫] ভট্টপল্লীর বকুলতলা (বিন্ধ্যবাসিনীতলা) নিবাসী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ শ্রী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ভুবনমোহিনী দেবীর একমাত্র জামাতা শ্রীজীবের সহধর্মিনী ছিলেন সুনীতি দেবী।[৬]

শিক্ষা ও কর্মজীবন:

শিক্ষা: পিতা পঞ্চাননের কাছেই তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হয়, পরে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল; এরপর রিপন কলেজ সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ সালে এম.এ. শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন এবং ১৯২১ সালে প্রাচীন নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থানার্জন করেন। ১৯২২ সালে ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর শ্রীজীব হলেন একাধারে ন্যায়তীর্থ, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ; সাথে ছিল তাঁর অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান। এর পাশাপাশি মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের থেকে ন্যায়পাঠের ফলে তিনি ন্যায়ে বিশেষ বৈদগ্ধ্যতা অর্জন করেন। ইংরাজী ভাষাজ্ঞানেও তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ। পরবর্তী সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে তিনি 'Evolution of Modern Logic' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই প্রবন্ধটিই পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *'Antiquity of Nyaya Sutra'* নামাঙ্কিত হয়ে প্রকাশ পায়।[৭]

অধ্যাপনা: পিতার চতুষ্পাঠীতেই ছাত্র-অধ্যাপনার দ্বারা শ্রীজীবের কর্মজীবন শুরু হয়। শিক্ষাজীবনান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন[৮] উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের[৯] আগ্রহে শ্রীজীব মহাশয় ১৯৩৬-১৯৫৮ সময়াবধি অধ্যাপনা কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০-১৯৬৩ সাল পর্যন্ত নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অবৈতনিক ও অস্থায়ী অধ্যাপক রূপে তিনি সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা কার্যেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি সুদীর্ঘকাল ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদালংকৃত করেছেন।

অন্যান্য কর্ম: শ্রীজীব সঙ্গীতশাস্ত্রে বেশ দক্ষ ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন সঙ্গীতকার, সুরসংযোজক এবং গায়ক। বহু সংস্কৃত সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন; সেই সংগীতে কণ্ঠ দিয়েছেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়[১০] ও শ্রীমতী রত্না চক্রবর্তী[১১] প্রমুখেরা। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সরাসরি ভাবে যুক্ত; ১৯২১ সাল থেকেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত। তাঁর বিধানসভায় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাও জানা যায়।[১২] শ্রীজীব ভট্টাচার্য, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত 'আর্যশাস্ত্র' পত্রিকায় যুগ্ম সম্পূজক ছিলেন এবং 'ব্রাহ্মণ সমাজ' ও 'প্রণব পারিজাত' নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক রূপে তিনি সুদীর্ঘকাল কাজ করেছেন।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সাহিত্য-সাধনাঃ

কাব্যরচনা ও সম্পাদনার কাজে সন্দেহাতীতভাবে পিতৃস্বভাব শ্রীজীবেরর উপর বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল। তাই পিতার মৃত্যুর (১৯৪০) পর রচনাকার্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। তাঁর সেই বিশাল সারস্বত-কর্মকীর্তিগুলিকে গ্রাহ্যত্বের বিষয়াধারে নিম্নরূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি-

শ্রব্যকাব্য:

যে কাব্যগ্রহণের কারক শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে থাকে, সেই কাব্যমাত্রই 'শ্রব্যকাব্য' রূপে বিবেচিত হয়। শ্রব্যকাব্যের মূল তিনটি বিভাগই কবি শ্রীজীব তাঁর রচনান্তর্গত করেছেন। এগুলি হল-

ক) মহাকাব্য: (অন্বীষা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-৭৬)

পাণ্ডববিক্রমম্[১৩] হল শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত অষ্টাদশ সর্গান্ত বিশিষ্ট মহাকাব্য। মহাভারতের কাহিনীই যে, এই কাব্যের উপজীব্য তা মহাকাব্যটির নামকরণ থেকেই সুস্পষ্ট। পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ পর্ব থেকে অজ্ঞাতবাসের সম্পূর্ণ কাহিনীকে আশ্রয় করে মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে। প্রায় ১৫০০ শ্লোকে নিবদ্ধ বীররসাশ্রিত পাণ্ডবগণের বীরগাথা কবি এই কাব্যে মুখ্যরূপে চিত্রিত করেছেন। মহাকাব্যটির মঙ্গলাচরণে কবি ব্রহ্মরূপী মায়া তথা জ্ঞানপ্রদাত্রী সরস্বতীকে বন্দনা করে বলেছেন-

"যা সর্বদা সর্বশরীরযুক্তা
করীররূপা জগতীলতায়াঃ ।
মায়া-চিদানন্দ-চিরত্নমূলা
সা জ্ঞানরত্নপ্রসববিস্তারম্ ।।"[১৪]

অর্থাৎ যিনি করীররূপা, মায়াময়ী, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপা, রত্নসমূহের মূল এবং সর্বশরীরযুক্তা হয়ে থাকেন সেই জ্ঞানপ্রসবিনী সরস্বতী প্রভূত জ্ঞান প্রদান করুন।

শ্রীজীব কেবল বিংশ শতাব্দীতে মহাকাব্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, সর্ববিধ পাঠক যেন কাব্যটির রসগ্রহণে সমর্থ হন, তার জন্য কাব্যটির বঙ্গানুবাদ এবং প্রথম ও শেষ (অর্থাৎ অষ্টাদশ) সর্গের ব্যাখ্যাসহ 'তরলা' নামক স্বরচিত টীকাবধি যোজনা করেছেন। টীকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"पाण्डवविक्रमटीकामौषधवटिकामिवाल्पपरिमाणाम् ।
करोमि बोधन शोधन कृतेऽजनृणामित्तर्णाम् ।।" [১৫]

-যেমন ঔষধ বটিকা অল্প অল্প করে আর্তজনের রোগ সারাতে সমর্থ হয়, তেমনি এই টীকার দ্বারা পাঠককুলের শোধন ও বোধন সম্পন্ন হবে।

সমস্যাবহুল মানব জীবনের যে নিরন্তর যুদ্ধ এবং তার থেকে মুক্তির উপায় কবি পাণ্ডবগণের চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। রাজপুত্রগণ, রাজকন্যা তথা রাজবধূ দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যতটে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কালাতিপাত করছেন; পাণ্ডবদের এই হৃদয়বিদারক দুঃখ কবির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে-

"वनेऽटतां कण्टकगुल्मवल्लीप्रतानवल्मीकशीलावकीर्णे ।
मुनिव्रतानामिव पाण्डानांच सम्मार स द्वादशहायनानि ।।"[১৬]

কাব্যে কবির জীবন ও দর্শন প্রতিবিম্বিত হয়। জ্ঞান, ধর্ম অথবা সত্য যতই গুপ্ত হোক না কেন! তার প্রকাশ অবশসম্ভাবী- *"दीपस्य भाः स्याद् विवरात् प्रतीता । सङ्गोपितस्यापि गृहैककोणे ।।"*[১৭] তাই প্রিয়জনের অনুযোগ গ্রহণীয়- *"प्रियास्चिकित्सां दधते न कुत्साम् ।"*[১৮] - কেননা, এই পৃথিবীতে যোগ্য মন্ত্রণাই প্রকৃত শক্তি- *"युक्ति र्हिशक्ति प्रथते पृथिव्याम् ।"*[১৯] বনবাস যদি বা কাটল, কিন্তু বৎসরকালের অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবগণ কোথায় নিজেদের সংগোপন করবেন? এ বিষয়ে চিন্তিত পাণ্ডুপুত্র শুনতে পেলেন এক আকাশবাণী- *"पतङ्गवद् वर्णविपर्य्ययेण रक्षात्मसत्तां रिपुवीक्षणाच्च ।।"*[২০] -পতঙ্গের ন্যায় বর্ণপরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মগোপন কর।

সমালোচনা:

জীবন-দর্শনের নানা পাঠ দিয়েছেন কবি এই মহাকাব্যের দ্বারা। সত্যের পথেই জয় এবং মানবজীবনে সর্বোচ্চ দুঃখের পরেই যে সুখের হাতছানি- তাই যেন কবি বলতে চেয়েছেন। *সাহিত্যদর্পণে* আচার্য বিশ্বনাথ যে ক্রমে অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবেই কবি মোট ১১২টি শ্লোকে ৯২টি অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

এ কাব্যে কবির বসন্ততিলক ছন্দে কুশলতার প্রমাণ মেলে। তবে ত্রয়োদশাক্ষরা *মত্তময়ূর, মৃগেন্দ্রমুখ*; এছাড়াও স্বল্প প্রচলিত *কলহংস, মঞ্জুভাষিণী* ও *ভুজঙ্গপ্রয়াত* ছন্দের প্রয়োগও মহাকাব্যটিতে দৃষ্ট হয়।

খ) চিত্রকাব্য: (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫)

সারস্বতশতকম্ নামক চিত্রকাব্যটির বিশেষত্ব হল, এটি বাংলা এবং সংস্কৃত- উভয় ভাষাতেই রচিত। যেমন-

'শুভ্রোজ্বলে শতদলে তব পাদপদ্ম
শোভা ধরে মধুরিমা ভুবন প্রকাশে।
ঊষা কিশলয়ে তব দেবি! সদ্যো
ভাসে চখে শশিকলা বিকলা প্রকাশে।'[২১]

এই কাব্যে স্বস্তিকাবন্ধ, মুরজবন্ধ, শঙ্খবন্ধ, ঘন্টাবন্ধ, পতাকাবন্ধ, ঘটবন্ধ, আসনবন্ধ, বৃক্ষবন্ধ, লতাবন্ধ, নৌকাবন্ধ, মাল্যবন্ধ, হরিবন্ধ -ইত্যাদি পরিকরবন্ধে চিত্রকাব্যটিকে বিন্যস্ত করেছেন। দেবতা তো সংখ্যায় বহু, তবে তাঁদের মধ্যে দেবী সরস্বতীকে নিয়ে শ্লোকশতাত্মিকা *'সারস্বতশতকম্'* রচনার উদ্দেশ্য কি? কেনই বা তিনি দেব-মনুষ্য নির্বিশেষে সকলের আরাধ্যা? দেবতারা দেববাণীর আরাধনা করবেন- এতো স্বাভাবিক। কিন্তু নির্ধনব্যক্তি কেনই বা দেবী সরস্বতীর আরাধনা করবেন? -এমন বহু প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান ঘটেছে এই চিত্রকাব্যের মাধ্যমে। উপাসনার দ্বারা লব্ধা সরস্বতী কিভাবে যুগে যুগে উপাসকের প্রতি তাঁর কৃপাবর্ষণ করেন- তাও দৃষ্টান্ত যোগে এই কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"सारदा सारसाध्यासा साध्या साच्युत वेधसा।
साधवे दत्त सातास्तु स्तुता साद्य सदारसा।।"[২২]

- সেই সদারসা অর্থাৎ সদানন্দময়ী সরস্বতী পদ্মাসীনা; বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আরাধ্যা। আজও স্তুতা হয়ে সাধুজনের সুখদায়িনী হন।

সমালোচনা:

চিত্রকাব্য হল অলঙ্কার শাস্ত্রের তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য।[২৩] কবি যদি বর্ণ গুলিকে এমনভাবে সাজাতে পারেন- যাতে একটি কল্পিত রেখা দ্বারা এক একটি চিত্র নির্মিত হয়, তবে সেই চিত্রযুক্ত কাব্য 'চিত্রকাব্য' নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। শ্রীজীব রচিত *সারস্বতশতকম্*[২৪] একটি ১০৮টি শ্লোক সমন্বিত তেমনই এক মনোহারী কাব্য; যা পর্ববিন্যাস ও রচনার সৌষ্ঠবে শ্রীজীবের এক আলোকসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। এই কাব্যনির্মিতিটিতে ৬৬টি চিত্র ও তার অনুরূপ শ্লোক ছাড়াও অতিরিক্ত ৫৬টি শ্লোক রয়েছে। ন্যায়তীর্থ মহোদয় এই কাব্যটিকে তৎকালীন ভারত-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের করকমলে উৎসর্গ করেন।

গ) খণ্ডকাব্য: (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮০)

গীতিকাব্যটির প্রারম্ভে ঋতুরাজ বসন্ত এবং পরিশেষে শীতঋতুর আহ্বায়িত হয়েছে। সর্বমোট ৫৬টি শ্লোকে নিবদ্ধ হয়েছে কাব্যটি। বসন্তের আগমনে কবি বললেন-

'किमिव नवसुन्दरं परमसुखमन्दिरं
जातमिदमनद्यतनविश्वम्।
सकलशुभलक्षणं प्रकटितनुक्षणं
नयनयुगं पश्य सुखदृश्यम्।।'[২৫]

বসন্তপুরুষের আগমনে বনতটের শোভাবর্ণনায় কবি বলেছেন-

'कुन्दकुसुमोज्ज्वलो गुञ्जदलिचञ्चलो

रङ्ग इव भाति वनदेशः
चूततरुरुच्छिग्रतो मुकुलकुलभूषितः
पुरुष इव वनदेशः ।।"[২৬]

মোট আটটি শ্লোকে বসন্তের বর্ণনান্তে গ্রীষ্মের আগমন ঘটেছে। জনগণের দুঃসহ এই গ্রীষ্মঋতুকে কবি দশটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। তবে সূর্যের অগ্নিকণার মতো রশ্মিজাত তীব্র দাবদাহে শ্রান্তজনের দুঃখ কিছুটা প্রশমিত করে এই ঋতুর ফলসম্ভার। তারই বিষয়ে কবি বললেন-

"पक्वचूतपनसोद्भवगन्धः
परिणतजम्वुफल निष्यन्दः ।
युवगणरसानां सरसीकूर्वन्
जनयति जनहृदि मोदमपूर्वम् ।।"[২৭]

এরপর বর্ষাবর্ণনায় কবি বললেন- বর্ষার কালো মেঘ, মাঝে মাঝে পীতবর্ণের বিদ্যুৎ আর প্রকট বজ্রধ্বনি যেন শ্যামল ক্লান্তিময় পীতাম্বরসদৃশ। আর সাথে তার এই প্রকট কুলিশধ্বনি যেন পাঞ্চজন্যের নাদ-

"गगनं सघनं श्यामलभासं
विद्युदुदयकृतपीतविलासम् ।
अनुकुरुते ननु केशववेशं
पाञ्चजन्यरववज्रोन्मेषम् ।।"[২৮]

দীপ্তিময়ী রাজবধূর মতো শরৎরাণীর রূপ বর্ণনায় কবি বললেন-

"नववेशधराः सुखिताश्च नराः
कृषिपूर्णधरा पथि पङ्कहरा ।
विहगा मुखरा रविभाः प्रखरा
शशिकम्रकराःशरदोऽपि वराः ।।"[২৯]

-এই সময় জনগণ আনন্দিত; কেননা জগজ্জননী মা দুর্গা সন্তানাদি সহ ধরিত্রীতে পদার্পণ করে থাকেন। *"शरदवसाने भुवि हेमन्तः...*"[৩০]- শরৎশেষে হেমন্তের আগমন। জনজীবনে এই সময়টি তেমন পৃথকভাবে উপভোগ্যা না হলেও দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান বর্তমান। এই সময়ের বৈষ্ণববৃন্দের প্রাণের উৎসব রাসপূর্ণিমার উল্লেখ করতে কবি বলেছেন-

"राधाकृष्णप्रेमविलासो
जयति किशोरक्रीडनरासः ।
भक्तजन प्रियदर्शन एष
स्पुरति पुरोयुगलोज्ज्वलवेशः ।।"[৩১]

এরপর আসে শীতের আগমনবার্তা। মৃদুমন্দ শীতল বাতাসে বৃক্ষসমূহের পর্ণরাজি শুকিয়ে যায়। পর্যটন এই সময়ে উপভোগ্য হলেও দরিদ্রজনের কাছে এই ঋতু বড় কষ্ঠের। ঋতুর এমন পক্ষপাত কিন্তু সূর্যের কাছে নেই। সে উদিত হয়ে ধনী-গরিব নির্বিশেষে তাপ প্রদান করে-

"उदिते सवितरि वितरति किरणे तीर्णाः शीतरुजार्त्ति
दीना धनिनः क्षीणा वलिनस्तन्वत आशु च वृत्तिम् ।
कुन्दकुसुमकलिकृतपुष्पाञ्जलिरभि रविसुन्दरबिम्बं
देवी प्रकृतिः पूजयति श्रुतिकथितं सत् प्रतिबिम्वम् ।।"[৩২]

আলোচ্য কাব্যটির প্রতিটি শ্লোকই গীতিময়তায় পূর্ণ। প্রতিটি ঋতুকে বর্ণনা করতে কবি সঙ্গীতের মাধুর্য্য সৃষ্টি করেছেন- যা পাঠকের চিত্তাপহারক। কবির কাব্যত্ব গুণ এই কাব্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

সমালোচনা:

প্রথিতযশা কবি শ্রীজীব মহাকবি কালিদাসের *‘ঋতুসংহার’*-এর ন্যায় *‘ঋতুচক্রচঙ্ক্রমণম্’* নামক একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। তবে তিনি কালিদাসকে অনুকরণ করেননি, অনুসরণ করেছেন মাত্র। অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীবকে মহাকবি কালিদাসের সাথে তুলনা করে বলেছেন- *“এ কাব্য যেন আজকের কালিদাসের ঋতুসংহার।”*[৩৩]

দৃশ্যকাব্য:

শ্রব্যকাব্য ভিন্ন কাব্যের অপর বিভাগটি হল দৃশ্যকাব্য, যা মূলত শ্রব্য ও দৃশ্য (audio-visual) উভয়যোগ্য। দৃশ্যকাব্যকে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে ‘রূপক’, ‘নাট্য’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দশরূপকই শ্রেষ্ঠ –*“সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ”*[৩৪] এই মহাবাক্য মেনে নিয়ে কবি শ্রীজীব রূপক রচনায় অধিক মনন করেছিলেন- তা তাঁর রচিত রূপকের সংখ্যা দেখে সহজেই অনুমিত হয়। মহাকবি শ্রীজীব রচিত রূপকগুলি বিভাগাদিক্রমে নিম্নরূপ-

ক. নাটক:

দশবিধ রূপকের মধ্যে নাটকের স্থান সর্বাগ্রে। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের[৩৫] মতানুসারেই খ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন বা জীবনাশ্রিত কাহিনী ও প্রসিদ্ধ মহাকাব্যিক বৃত্তান্ত, কবি শ্রীজীবের লেখনীতে নাট্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ-

ক.১. মহাকবি কালিদাসম্ (রূপকচক্রম্, ১৯৭২):

মহাকবি কালিদাসের সাথে জুড়ে আছে অসংখ্য কাহিনী। কবি শ্রীজীব সেগুলির মেলবন্ধনে পঞ্চাঙ্কের এক অপূর্ব নাট্যকাহিনী পরিবেশন করেছেন। নাট্যকাহিনী এমত- দশপুরের রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী তিন রাজকুমার নরেন্দ্র-সমরেন্দ্র ও মথুরেশ রাজকুমারী বিদ্যাবতীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। এমন সময় তারা বৃক্ষশাখার অগ্রভাগে বসে শাখামূল ছেদনে তৎপর কূর্মনাথের দেখা পেলেন। তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে বিচারে অংশগ্রহণ করানো হল। যেহেতু কূর্মনাথ মৌন ছিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা বিচারে অংশ নিচ্ছিলেন তাই নরেন্দ্রাদি কূটচালে কূর্মনাথ জয়ী হন। কিন্তু বিবাহের পর বিদ্যাবতী স্বামী কূর্মনাথের বিদ্যাবত্তা পরীক্ষা করতে গেলে সত্য প্রকাশিত হল। কূর্মনাথ ‘উষ্ট্র’কে ‘উট্র’ বলায় বিদ্যাবতী ক্রন্দন করে বলেন-

“হা দূর্দৈবম! ধিক্ ধিক্ মে বিদ্যাবিভবম্ যদহম্বিদ্যাহীনস্য হস্তযোঃ পতিতাস্মি।”[৩৬]

এরপর কূর্মনাথ স্ত্রী কর্তৃক বিতাড়িত হন। তৃতীয়াঙ্কে দেখি নর্মদানদী সংলগ্ন শ্মশান-বনতটে কালিদাসে স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী শ্বেতকালিকা কূর্মনাথকে বর দেন- *“বাগ্বিভূতিমান্ ভব, বিশ্ববিজয়ী ভব।”*[৩৭] এরপর রাজা বিক্রমাদিত্যের শিবিকাবহনের জন্য কালিদাস ধৃত হলেন, পরে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিক্রমাদিত্য তাঁকে নবরত্ন সভার রত্নরূপে স্বীকৃতি দিলেন। বিক্রমাদিত্যের মধ্যস্থতায় অনুতপ্তা স্ত্রীর সাথে তাঁর পুনর্মিলনের মাধ্যমে নাট্যসমাপ্তি ঘটে।

সমালোচনা:

রূপকটি শৃঙ্গার রসাশ্রিত; সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ উভয়ের প্রয়োগই এক্ষেত্রে দেখা যায়। কবি শ্রীজীব চরিত্ররূপায়ণ থেকে শুরু করে নাট্যশাস্ত্র সম্মত নিয়মানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, বিষ্কম্ভক, অঙ্কাবতার, সন্ধি, গর্ভাঙ্ক, ভরতবাক্য-

এমনকি ভৃত্যের মুখে প্রাকৃতের ব্যবহারটুকুও স্বাচ্ছন্দ্যে নিষ্পন্ন করেছেন। রূপকটিকে নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে। নাটকটি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত প্রথম 'কালিদাস-সমারোহে'[৩৮](১৯৫৮ সালে) অভিনয়ের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, অশোক চ্যাটার্জী প্রমুখ খ্যাতিমান সংস্কৃত অধ্যাপকেরা তথায় এই নাটকে অভিনয়াবধি করেছিলেন।

ক.২. শ্রীশঙ্করাচার্য-বৈভবম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৬৬):

এই রূপকে স্বয়ং মহাদেব শঙ্করাচার্য রূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ডের উপদেশ প্রদান করেন। মহাদেবপুত্র কার্তিকেয় কুমারিলরূপে এবং সুধন্বা রাজার রূপে দেবরাজ ইন্দ্রের মর্ত্যাগমন ঘটে। আচার্য শঙ্করের জন্ম, শৈশব ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের জন্য মাত্রিজ্ঞালাভ -এইসব বিষয় নাটকীয়তার সাথে বর্ণিত হয়েছে এই জীবনীমূলক রূপকটিতে।

সমালোচনা:

'শ্রীশঙ্করাচার্য-বৈভবম্'[৩৯]- শ্রীজীব রচিত চরিত্রমূলক রূপক বিশেষ, যা সারস্বত ব্যক্তিত্ব শঙ্করাচার্যের জীবনাবলম্বনে রচিত। বিংশ শতকের মধ্যভাগে জীবনীমূলক রূপক রচনা বেশ সমাদৃত ছিল। যেমন- মহারাষ্ট্রের কবি পণ্ডিতা ক্ষমা রাওয়ের *'তুকারামচরিতম্'*[৪০], *'জ্ঞানেশ্বরচরিতম্'*[৪১]; এস.বি.বর্ণেকরের *'বিবেকানন্দ-বিজয়ম্'*[৪২]; বিহারের কবি ভবানীশঙ্কর ত্রিবেদীর *'ম্যাক্সমূলর-বৈদূষ্যম্'*[৪৩] প্রভৃতি। এই রচনারীতির প্রভাব বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও দেখা যায়। এগুলি হল- যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত *'দেশবন্ধু দেশপ্রিয়ম্'*[৪৪], *'ভারতলক্ষ্মীনাটকম্'*; নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত *'সুভাষবিজয়ম্'*, *'বঙ্গকীর্তি-বিধানম্'* -এই একই ধারার রচনা। কবি শ্রীজীবও এই ধারায় গা ভাসিয়ে রচনা করেছেন *'শ্রীশঙ্করাচার্য-বৈভবম্'*।

ক.৩. নাগনিস্তারম্ (প্রণব পারিজাত, ১৯৭৬):

মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ জনমেজয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই রূপকের অঙ্কসংখ্যা মোট ছয়টি। এটি অদ্ভুত রসাশ্রিত রূপকবিশেষ।

সমালোচনা:

এই নাট্যে সঙ্গীতের মাধ্যমে কোথাও নারায়ণ স্তুতি, কোথাও কৃষ্ণের মহিমা, কোথাও আবার ভাবী ঘটনা সূচিত হয়েছে।

ক.৪. রঘুবংশম্ (প্রণব পারিজাত, ১৯৬২):

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণের কাহিনী অবলম্বনে ১৯ টি সর্গে রচিত *রঘুবংশম্* কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে একটি। রাজা দিলীপের বর্ণনা দিয়ে এ কাব্যের সূচনা, মোট ২৮জন (মতান্তরে ৩১জন) রঘুবংশীয় রাজার বর্ণনা এতে বর্তমান। ১৫৬৯ টি শ্লোকে নিবদ্ধ এই কাব্যের অন্তিমে রাজা অগ্নিবর্ণের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

সমালোচনা:

কবি শ্রীজীব সমনামেই উক্ত মহাকাব্যটির নির্বাচিত অংশ তথা রাজা দিলীপ থেকে রাজা দশরথের কাহিনীকে নাট্যরূপ প্রদান করেছেন।

ক.৫. কুমারসম্ভবম্ (প্রণব পারিজাত, ১৯৬২):

কুমার কার্তিকেয়ের জন্মের সূচনাধারে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ১৭টি সর্গে মহাকবি কালিদাস *কুমারসম্ভবম্* নামক মহাকাব্যটি রচনা করেন।

সমালোচনা:

কবি শ্রীজীব এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তুকে আহরণ করে সমনামেই এই রূপকটি রচনা করেন। এটি একপ্রকারে কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যের নাট্যরূপ।

এছাড়াও শ্রীজীব রচিত অন্যান্য নাটকগুলি হল- *বিবেকানন্দচরিতম্* (পাঁচটি অঙ্ক সমন্বিত), *নিগমানন্দচরিতম্* (ছয়টি অঙ্কে নিবদ্ধ), *সাম্যতীর্থম্, স্বাধীনভারতবিজয়ম্, দধিচেরাত্মবলিদানম্, রামকৃষ্ণচরিতম্* প্রভৃতি।

খ. প্রকরণ:

দশবিধ রূপকের মধ্যে নাটকের পরেই প্রকরণের স্থান। কবি শ্রীজীব *'মাধুরীসুন্দরম্'* নামক একটিমাত্র প্রকরণ রচনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল-

খ.১. মাধুরীসুন্দরম্ (প্রণব পারিজাত, ১৯৭২):

প্রবাদপ্রতিম বীণাবাদক সুন্দরসিংহ এবং রাজকুমারী মাধুরীর অপূর্ব প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে শ্রীজীব দশটি অঙ্কে *'মাধুরীসুন্দরম্'* প্রকরণটি রচনা করেন। মহাবল কর্তৃক সুন্দরের অপমান ও রাজ্য থেকে বিতাড়ন সহ সুন্দরসিংহের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অর্থাৎ বীণার ঝংকারে কিভাবে মানুষ তথা প্রকৃতি প্রভাবিত হয় -সে সকলই এই প্রকরণে বর্ণিত। নানা নাটকীয় উৎকণ্ঠার পর সুন্দর ও মাধুরীর পবিত্র মিলন ঘটে। আলোচ্য রূপকে পবিত্র প্রেমের পূজারী শ্রীজীব প্রার্থনা করেছেন, গুণীজনের গুণ যেন সমাদর প্রাপ্ত হয়- *"সভাসু ভূয়াদ্ গুণিনাং সমাদরঃ।পবিত্ররূপঃ প্রণয়োঽস্তু পূজিতঃ।।"*[৪৫]

সমালোচনা:

অনেকে মনে করেন, ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রবাদপুরুষ যদুভট্টের[৪৬] জীবনাশ্রয়ে শ্রীজীব *'মাধুরীসুন্দরম্'* রূপকটি রচনা করেন।

গ. ভাণ:

বিশ্বনাথোক্ত দশবিধ রূপকমধ্যে ভাণের স্থান মূলত তৃতীয়। একাঙ্ক রূপক ভাণের প্রধানচরিত্রাধিকারী বিট এককভাবেই বিষয়বস্তুর অবতারণা করে থাকেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাণের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। পূর্বসুরীদের অনুসরণ করে শ্রীজীব তাঁর কৃতিসঞ্চয়ে দুটি ভাণ রচনা করেছেন। যথা-

গ.১. বিধিবিপর্যাসম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫০)

১৯৪৪ সালে পুণা শহরে অনুষ্ঠিত 'ড্রাফট হিন্দু কোড বিল' নিয়ে যে ঐতিহাসিক সম্মেলন হয়, সেই বিষয়কে উপজীব্য করে কবি আলোচ্য ভাণটি রচনা করেন।

গ.২. পুরুষপুঙ্গবম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৬২)

শ্রীজীব রচিত *পুরুষপুঙ্গব* নামক ভাণ শ্রেণীর রূপকে- নায়ক বাগ্‌বীর একটিমাত্র অঙ্কে সম্বোধন, আকাশভাষিতের দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে নাট্যোক্তি প্রকাশ করেন। যদিও বীর বা শৃঙ্গার কোনোটিই এই রূপকের অঙ্গীরস নয়, ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস রূপকটির অঙ্গীরস হিসাবে সঙ্গত। বাগ্‌বীর- এমন একটি ব্যক্তি, প্রবঞ্চনাই যার মূল অস্ত্র। তাঁর প্রতিটি কথাই স্বার্থপ্রণোদিত। সে নারী-স্বাধীনতার পক্ষে। পরস্ত্রীদেরকে সে স্বেচ্ছাচারিতার উপদেশ দেয় কিন্তু নিজের স্ত্রীর বেলায়- তার পরপুরুষের সাথে বাদানুবাদও নিষিদ্ধ বলে মনে করে। তার মতে- *"যদিদং স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমুপদিশ্যতে সধবানাম্ অধবানাং বিধবাং বা তৎসর্বং পরনারী-বিষয়ম্।"*[৪৭] শ্রীজীব বাগ্‌বীর চরিত্রের দ্বারা পুরুষশাসিত সমাজের কিছু মুখোশধারী পুরুষকে উপস্থাপিত করেছেন।

সমালোচনা:

শ্রীজীবের রচনায় ভাণের সংখ্যা মাত্র দুটি হলেও, নাট্যকার রূপে ভাণ রচনা তাঁর অসাধারণ নাট্যব্যক্তিত্বকে উপস্থাপিত করে।

ঘ. ব্যায়োগ:

দশরূপকে ভাণের পরেই ব্যায়োগের স্থান। কবি শ্রীজীবও পূর্বাসুরীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে মাত্রদুটি ব্যায়োগ রচনা করেন। এদুটি হল-

ঘ.১. কৈলাসনাথবিজয়ম্ (সংস্কৃত প্রতিভা, ১৯৫৯):

লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্তৃক কৈলাস উৎপাটনের কাহিনীকে আশ্রয় করে *কৈলাস-নাথ-বিজয়ম্* নামক ব্যায়োগ শ্রেণীর রূপকটি রচিত। একাঙ্ক বিশিষ্ট বীররসাশ্রিত রূপকটিতে মহাদেবের সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে রচিত।

ঘ.২. গিরিধরসংবর্ধনম্ (সংস্কৃত সাহিত্য রত্নাবলী পত্রিকা, ১৯৫৯):

শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্দ্ধনকে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণের কাহিনীকে আশ্রয় করে এই ব্যায়োগ শ্রেণীর রূপকটি রচনা করেছেন নাট্যকার শ্রীজীব। রূপকটি বীররসাশ্রিত। যদিও রূপকের নামকরণটি এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্ডিত গিরিধর শর্মা চতুর্বেদীর[৪৮] রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তির সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে এই রূপকটি মঞ্চস্থ হয়; তাই এই রূপকের সময়কাল ১৯৫৪ সাল বা তার পরবর্তী সময় বলে অনুমিত হয়।

সমালোচনা:

বীররসাশ্রিত ব্যায়োগ দুটিতে বাস্তব জীবনের বিষয়ের সাথে নাট্যের নামকরণের বিষয়ে শ্লেষার্থক বোধক হওয়াতে, কবি শ্রীজীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য নাট্যপ্রতিভার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

ঙ. প্রহসন:

শ্রীজীব রচিত প্রহসনের সংখ্যা ঠিক কত তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হয়নি, প্রাপ্ত প্রহসনগুলি উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করছি। নাট্যকার শ্রীজীব রচিত প্রহসনগুলি একটু বিশেষ প্রকৃতির; সেখানে হাস্যরস প্রধান হলেও বিষয়গুলি ছিল সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তাবহ। কবির রচনারীতিতে এই রূপকগুলি হয়ে উঠেছিল- ব্যঙ্গ্যাত্মক হাস্যরস প্রধান প্রহসন। নিম্নে প্রহসনগুলির পরিচয় উপস্থাপন করা হল-

ঙ.১. ভট্টসংকটম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯২৬):

ভট্টসংকটম্[৪৯] মূলত পাঁচ অঙ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসন। প্রহসনের নায়ক- একজন যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণ, তার নাম ভট্ট, তার স্ত্রী কামিনী কুরূপা ও কটুভাষিণী। তাদের স্বামী-স্ত্রীর কলহ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। ব্রাহ্মণ ভাবেন কামিনীর যেমন রূপ তেমনি তার ব্যবহার- একই অঙ্গে ভগবানের এ এক অপূর্ব লীলা! অন্যদিকে প্রতিবিম্বে স্বামীর মুখ দর্শিত হলেও কামিনী ভাবে তার নরক দর্শন হল। এমতাবস্থায় বলাক ও বিরোধ নামের দুটি রাক্ষস কামিনীকে অপহরণ করে। স্ত্রীবিহীনে যজ্ঞ সম্পাদনের উপায় নেই, তাই ভট্ট রাজার শরণ নেন। রাজা বলেন- *"দারান্তর-গ্রহণং কর্তব্যম্ ।"* কিন্তু ভট্ট তাতে মোটেও সম্মত নন। রূপ-গুণহীনা হলেও কামিনী তো তার ধর্মপত্নী! অন্যদিকে রাজা রাক্ষসযুগলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন- ব্রাহ্মণের 'উচ্চাটন' মন্ত্রপ্রয়োগই তাদের কষ্টের কারন। কিন্তু যজ্ঞ তো ব্রাহ্মণের ধর্ম। রাক্ষসেরাও রাক্ষসধর্মও তো তাদের 'বিধাতৃবিহিতা বৃত্তিঃ'। রাজা তখন নিদান দিলেন- রাক্ষসেরাও আর যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাবে না, তবে- *"ব্রাহ্মণেনাপি উচ্চাটনমন্ত্রাঃ ন পঠিষ্যন্তি ।"* ব্রাহ্মণ আর উচ্চাটন মন্ত্র পাঠ করবে না -এভাবেই সববিরোধের অবসান ঘটল।

সমালোচনা:

প্রহসনটির মূল বক্তব্য দুটি; প্রথমটি সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরস্থায়ী। যে কোনো অবস্থাতেই তার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যত্নবান হতে হবে। দ্বিতীয়টি সমাজ সম্পর্কে; রাক্ষসদ্বয় কামিনীকে অপহরণ করলেও ব্রাহ্মণকে বলেছে- *"ব্রাহ্মণ, ন বয়ং মানুষভক্ষকাঃ, ন বা পরকামিনীলোলুপাঃ রাক্ষসাঃ।"*[৫০] সমাজকে নাট্যকারের বক্তব্য এই যে- যদি শান্তি চাও তবে কেউ কারোর অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না। যে যার নিজ অধিকারে থেকে কর্তব্য পালন কর; তাতেই সমাজে শান্তিপূর্ণ থাকবে।

৬.২. পুরুষরমণীয়ম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৪৮):

কুম্ভকোণমের তথা 'কাঞ্চী কামকোটির পীঠে'র জগৎগুরু শঙ্করাচার্য **১৯৩৩** সালে পদব্রজে ভারত পরিভ্রমণ করেন। সেইসময় তিনি বাংলার তীর্থস্থান পরিদর্শনে এলে 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা'র উদ্যোগে পঞ্চানন তর্করত্ন ও শ্রীগুরুপদ হালদারের নেতৃত্বে একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভাকে অবিস্মরণীয় করতে শ্রীজীব পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট প্রহসনটি রচনা করেন এবং তথায় এটি উপস্থাপিত হয়।

সুবন্ধু ও সোমদত্ত নামের দুইবন্ধু শিক্ষান্তে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে জানতে পারে, প্রদেশান্তরের সীমন্তনী নাম্নী রাণী প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতিকে কিছু দান করবেন। সেই উপহার পাবার উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধ দম্পতির পরামর্শে সোমদত্ত এক নারীর বেশধারণ করে। এভাবে তাদের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়। কিন্তু পরম শিবভক্ত রাণীকে ঠকানোর ফলে উপহার প্রাপ্তির পর সোমদত্ত পুনরায় তার পূর্বাবস্থা ফিরে পেতে চাইলেও তা আর সম্ভব হয়না। তাই উপায়ান্তর না দেখে নারীরূপী সোমদত্তকেই সুবন্ধু বিবাহ করেন – এই হল *পুরুষরমণীয়ম্*[৫১] প্রহসনটির কাহিনী।

সমালোচনা:

রূপকের বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল- সুবন্ধু ও সোমদত্ত দুজনেই শিক্ষিত অথচ বেরোজগার -অর্থাৎ সমাজে বেকারত্বের সমস্যা তখন দেখা দিতে শুরু করেছে! শিক্ষা মূলত মূল্যবোধের জন্ম দেয়, তাই শিক্ষিত ব্যক্তিরা অশিক্ষিতদের মতো সকল কাজে এগিয়ে যেতে পারে না। রাণীর কাছে ভিক্ষা চাইতেও এই দুইবন্ধুর মন চাইছে না; তাই তাদের শুনতে হয়েছে, ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে দস্যুবৃত্তি ভালো। আবার প্রতিটি অপরাধেরই শাস্তি অবধারিত; কেননা নাট্যকার ঈশ্বরবিশ্বাসী। তাই রাণীকে প্রবঞ্চিত করার ফল হিসাবে সোমদত্ত-সুবন্ধুকে শাস্তি পেতেই হল।

৬.৩. চৌরচাতুরীয়ম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫১):

সুবুদ্ধিমান ঘটঙ্কর, পেশায় একজন চোর; সেই এই প্রহসনের নায়ক। সে চৌর্যবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ। কখনো কাণী বা অন্ধ, কখনো পাগল, কখনও বা মাতালের অভিনয় করে পুলিশের চোখে ফাঁকি দেয়। নাট্যবস্তুর দ্বিতীয়ভাগে এক সাধু তার বাড়িতে ভিক্ষার্থে আসে; তারই প্রভাবে ঘটঙ্করের জীবনে পরিবর্তন আসে, সে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগের সঙ্কল্প করে।

সমালোচনা:

শ্রীজীব এই প্রহসনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন- বিধাতার সৃষ্টিতে কে চোর নয়? কিন্তু শাস্তি পায় কয়জনে? ঘটঙ্করের মধ্যে মানবোচিত মনুষ্যত্ববোধ অবশিষ্ট ছিল, তাই তার চৈতন্য হল। কিন্তু বড় চোরেরা যারা নিজেদের মনুষ্যত্বই হারিয়ে ফেলেছে তাদের আর চেতনার উদয় হল কই! এ যেন সমাজের প্রতি এক তীব্র ভৎর্সনা! প্রহসনটির উপর *'হাস্যবিদ্যকথা'*র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৬.৪. চণ্ডতাণ্ডবম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫৩):

১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বিশ্বশান্তির জন্য স্বামী করপত্রীজি দিল্লীতে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে এই প্রহসনটি রচিত হয়। এটি দিল্লিতে মঞ্চস্থও হয়। দুই অঙ্কে প্রহসনটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বীভৎসতার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ক্ষমতায় উন্মত্ত নেতৃগণের দ্বারা সাধারণ মানুষের মৃত্যু যে কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে এই প্রহসনে। প্রহসনের মঙ্গলাচরণে বাণীর (দেবী সরস্বতীর) শুভাগমনের আশা করা হয়েছে সভাসদের মাঝে-*"...বাণী শুভানি বিদধাতু সভাসদং বঃ।"*[৫২] মুখনির্গত বাক্যের দ্বারাই উন্মত্ততা সৃষ্টি হয় সভাসদদের মধ্যে, তাই প্রথমেই বাগ্দেবীকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ঘটনাকে প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে– *"প্রাচ্যপ্রতীচ্যোভয়যুক্তিনৌকা-সঞ্চারশীলাऽপ্যচলস্বধর্মা"*[৫৩] - অর্থাৎ স্বধর্মের দ্বারাই অচল হওয়া সম্ভব। ক্রোধ ও লোভের পিতা পাপপুরুষ হিংসাকে অভয়প্রদান করছে ধর্মপুরুষের থেকে- *"হিংসে নট নট ভারতবর্ষ মানবশোণিতপানসহর্ষে!"*[৫৪] লোভ-ক্রোধ-ধর্ম-হিংসার রূপে হিটলার, স্তালিন, মুসোলিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিক নেতাদের চরিত্রের প্রবৃত্তিগত দিকটি মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধর্মপুরুষের কাছে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ যেন এই গণতান্ত্রিক দেশেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- *"ধর্মপুরুষ! ধর্মপুরুষ! ত্রায়স্ব নো দস্যগণত্রাসাত্।"*[৫৫]

সমালোচনা:

চণ্ডতাণ্ডবম্ প্রহসনটি *রূপকচক্রম্* নামক নাটক সংকলন গ্রন্থে ১৯৪৮ সালে মুদ্রিত হয়। প্রহসনটি একাধারে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশিষ্ট এবং প্রতীকধর্মী হওয়ার কারণে প্রহসনের চরিত্র উপস্থাপন অত্যন্ত Symbolic। কৃষ্ণমিশ্রের *'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্'*-এর সাথে প্রহসনটি তুলনীয়।

৬.৫. ক্ষুতক্ষেমীয়ম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫৬):

একাঙ্ক এই প্রহসনের প্রধান চরিত্র গৃহস্বামী রঙ্গনাথ- যিনি এতোটাই কৃপণ ও নির্দয় যে তার বাড়িতে চিত্রগুপ্ত গৃহস্বামীর স্বার্থসিদ্ধিকারী রূপে উপস্থিত হয়ে দৈবজ্ঞের মতো জানালেন- *"শ্রূয়তাং বর্ষমাত্রবশিষ্যতে ভবদায়ুঃ"*[৫৬] এবং বর্ষমাত্র আয়ুবৃদ্ধির উপায় স্বরূপ বলেন- *"বর্ষং ব্যাপ্য ত্বং দরিদ্রাণামুটজোপরি তৃণাচ্ছাদনং মুক্তো দেহি। এতেন পুণ্যেন ত্বদায়ুর্বৃদ্ধেনমাশাস্যতে।।"*[৫৭] আয়ুবৃদ্ধির জন্য রঙ্গনাথের দরিদ্রের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ পেল, তাতে বর্ষকাল বহু মানুষ উপকৃতও হল। চিত্রগুপ্ত সেক্ষেত্রে প্রশংসার সুরেই বলেছেন- *"বাতবর্ষাদ্পোদ্বেগাদ্ বহবো দীনাঃ রক্ষিতা অনেন।"*[58]

সমালোচনা:

ধনী-দরিদ্রের বিভাজন মুছে একে অপরের সেবায় সমব্যথী হতে বার্তা দেওয়া হয়েছে এই প্রহসনে।

৬.৬. স্বাতন্ত্র্যসন্ধিক্ষণম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫৭):

স্বাতন্ত্র্য সন্ধিক্ষণম্ প্রহসনের চরিত্রেরা হল- প্রাচ্যসংস্কৃতি, বিশ্ববন্ধু, ভারতমাতা, দুর্নয়, যতিবর প্রমুখ। ধনেশ-রমেশ-গণেশ প্রমুখ চরিত্রগুলি তরুণ সমাজের প্রতিভূ; তারা ফরাসি বিপ্লব, চীন বিপ্লব কিংবা গ্রীস-রোমের বিষয়ে জ্ঞানকে গর্ব মনে করে। ব্রিটিশ শাসকের প্রতিভূ চরিত্রটি 'শ্বেতাঙ্গ'- সে তরুণ সমাজকে স্বাধীনতার মতো মহার্ঘ্য বস্তু প্রদান করে- নিজের ঔদার্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরই মধ্যে হিন্দু-মুসলিমদের কলহের বীজরোপণ করে গেল তারা দেশভাগের মধ্যে দিয়ে। ফলস্বরূপ আমরা পেলাম- দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি আর কলহ।

সমালোচনা:

সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক স্তরে এই কলহ অদ্যাপি বিরাজমান। ইংরেজদের কূটনীতিকে শ্রীজীব এই প্রহসনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের সাথে এর রূপকধর্মীতার কারনে এই প্রহসন তুলনীয়।

৬.৭. শতবার্ষিকম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫৮):

শতবার্ষিকম্[৫৯] নামক প্রহসনটিতে বৈজ্ঞানিক মর্ত্ত্যমণি রকেট (রখেট) যন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মলোকে গিয়ে উপস্থিত হন। ব্রহ্মলোকে মঙ্গল-বুধ-শুক্র-চন্দ্র-রাহু সকলেই ভয়ে ভীত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা অবধি চমকিত! ব্রহ্মার সন্দেহযুক্ত প্রশ্নে শুক্র সবিস্তারে উত্তর দেন- *"ब्रह्मा – आं सशरीरः कथमयं समागतः? शुक्रः- कथयत्यय विज्ञानवलेन रखेटाख्ययन्त्र निर्माय भूमिखण्डादुप्यतन्ना।"*[৬০] ব্রহ্মলোকের কেউই মর্ত্ত্যমণিকে স্বাগত জানায় না। সকলেই তাদের অবস্থান নিয়ে আশঙ্কিত। ব্রহ্মার বিচক্ষণতায় সে সমস্যার প্রশমন ঘটে। তবে ব্রহ্মার উক্তিতে কবি যন্ত্রবিজ্ঞানের এই অবাধ উত্তরণকে এক সতর্কবার্তা দিয়েছেন- *"क्रियेत चेन्न यन्त्रीयविज्ञास्य नियन्त्रणम्।/शतवर्षान्तिरे पृथ्वी न्यूनं ध्वस्ता भविष्यति"*[৬১]

সমালোচনা:

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মশতবর্ষ উৎসবে এই প্রহসনটি অভিনীত হয় ১৯৫৭ সালে।

৬.৮. চিপিটকচর্বণম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫৯):

অত্যন্ত ধনলোভী এবং কৃপণ ব্যক্তি হলেন- এই *চিপিটকচর্বণম্*[৬২] নামক প্রহসনের নায়ক কপালী। তাঁর স্ত্রী রঙ্গিণীর সাথে রোজকার বিবাদের মধ্যে দিয়ে চিপিটকচর্বণ ব্রত পালনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। অন্যান্য চরিত্রগুলি- পঙ্গুরাম, মন্থরা, বৈদ্য, তান্ত্রিক নাট্যবস্তুর অন্য গতি এনেছে।

সমালোচনা:

নষ্টচন্দ্রদর্শন ও চিপিটকচর্বণের মতো প্রাচীন লোকরীতি এই প্রহসনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই প্রহসন অধুনাকালে ছাত্রপাঠ্য রূপে শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার অর্জন করেছে।

৬.৯ রাগবিরাগম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৫৯):

বিষয়-বাসনা থেকে মুক্তি, ভগবান লাভের উপায়স্বরূপ এই সঙ্গীতের প্রভাবই প্রহসনের প্রতিপাদ্য বিষয়। গীত প্রসঙ্গে ভিক্ষুকের মুখে কবি বলেছেন– *"गीतं हि सर्वेषां प्राणिनां क्षणिकदुःखविनाशको हर्षविकाशको ध्वनिः"*[৬৩] জনৈক সঙ্গীত বিরোধী রাজার দরবারে সঙ্গীতপ্রেমীমাত্রই অপরাধী; সেই অপরাধে অপরাধীর তালিকা বেশ দীর্ঘ; বীরমল্ল নামক সৈনিক, জনৈক ভিক্ষুক, তরুণতরুণীযুগল। তাদের আফশোস- *"अस्माकं राज्ञो दुर्भाग्यं यद्गीतरसाद् वञ्चितोऽयम्"*[৬৪] একদা তরুণীকৃত সঙ্গীতের কোমল আঘাতে রাজকুমার পিতৃহত্যা থেকে বিরত হন। রাজকুমারী মন্ত্রীপুত্রের সাথে দেশান্তরী হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে নিরস্ত হন। সন্ন্যাসী সংসারের মায়াকে তাচ্ছিল্যের সাথে নস্যাৎ করতে সমর্থ হন। তখন রাজার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়।

সমালোচনা:

একাঙ্কের এই প্রহসনটির মধ্যে দিয়ে কবি নৃত্যগীতসম্পর্কিত জ্ঞানের প্রকাশ দেখিয়েছেন। তাল-লয়-সপ্তক-মূর্ছনায় তিনি ভৈরব, কৌশিক, মেঘ, শ্রীরাগ, দীপক, হিন্দোল প্রভৃতি রাগের আলোচনা করেছেন। অখণ্ড ভারতের প্রতিটি প্রদেশের নাম এই প্রহসনে উল্লেখিত হয়েছে।

৬.১০. বিবাহবিড়ম্বনম্ (সংস্কৃত প্রতিভা, ১৯৬১):

১৮৫৭ সালে ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও তার শতবর্ষ পরেও বিধবাদের অবস্থান যে কতটা করুণ, তা এই প্রহসনে দেখা যায়। সে তুলনায় পুরুষের বহুবিবাহ কতটা সহজ ও সাবলীল -তার নির্দশন মেলে এই প্রহসনে। রতিকান্ত নামক জনৈক ষাটোর্ধ্ব মৃতদার এখানে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। তিনি নিজসেবার্থে ঘটক নিয়োগ করলেন বিবাহযোগ্যা পাত্রীর সন্ধানে। ঘটকের মাধ্যমে দরিদ্র ঋণগ্রস্থ পরিবারের চন্দ্রলেখা নামক সর্বসুলক্ষণা কন্যার সাথে রতিকান্তের বিবাহ স্থির হয়। রতিকান্তের ঘরেও এক বিধবা ভগিনী বর্তমান; কিন্তু সেই ভগিনীটির বিবাহ-ভাবনা কখনো রতিকান্তের মনে আসেনি। যদিও শেষ পর্যন্ত কয়েকজন তরুণের প্রতিবাদে সে বিবাহ প্রতিহত হয়। রতিকান্তের ঘরে বিধবা বোনটির স্থান অপর দাসদাসী অপেক্ষা ভিন্ন নয়-*'একো ভৃত্যো বিধবা ভগিনী কাচন দাসী প্রতিপাল্যন্ত ।'*[৬৫]-এই বাক্যেই বোঝা যায় সমাজপ্রতিভূ রতিকান্তের মানসিকতা!

সমালোচনা:

প্রহসনটি ১৯৬১ সালে 'সংস্কৃত প্রতিভা' নামক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। বিবাহ বিবাহ আইন মূলত কমবয়সী মেয়েদের কথা ভেবেই প্রণীত হয়েছিল বটে। তবে সমাজে তার প্রণয়ন যে কতটা কঠিন ছিল- তা এই প্রহসন থেকে কল্পনীয়।

৬.১১. সাম্য-সাগর-কল্লোলম্ (প্রণব পারিজাত, ১৯৬১):

সাম্যতার উদ্দেশ্যে আন্দোলন যেন জনরূপ সমুদ্রের কল্লোল ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'গণনাথ' নামক যুবনেতার চরিত্রের মাধ্যমে কবি দেখিয়েছেন, সে কিভাবে তার অনুগামীদের বিভ্রান্ত করছে। সে গণসৈনিকদের নির্দেশ দিচ্ছে- সহিংস হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনহরণ করতে। আহ্বান করছে কৃষক-শ্রমিকজনকে এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য। 'আপণিক' চরিত্রের মাধ্যমে কবি সাধারণ নিরীহ জনগণ কিভাবে অকারণ হিংসার শিকার হন, তা দেখিয়েছেন। আন্দোলনকারী যুবকগণকে আপণিক বলছে-*"মহোদয়াঃ । গৃহস্থধর্মমনুপালয়তা ময়া প্রত্যহম্ গৃহমাগতেভ্যঃ যাচকেভ্যো দীয়তে যথাশক্তি তণ্ডুলো গোধূমচূর্ণং গুডঞ্চ । বৈশাখে মাসি প্রতিদিনম্ আর্দ্র-চণক-গুড-জলানি দদামি শ্রমিক-কর্ষকাদিভ্যঃ পথশ্রান্তেভ্যো দীনদ্বিজেভ্যোऽপি"*[৬৬] এই 'দ্বিজ' শব্দ শ্রবণেও যুবগণের অস্বস্তি! তাতে তারা চিৎকার করে বলছে-*"দ্বিজেভ্যোऽপি বদন্ ন লজ্জসে?"*[৬৭] দ্বিজমাত্রেই তো শিখা-তিলকধারী প্রবঞ্চক! নেতার আদেশ মতো আপণিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও তার শিশুপুত্রকে হত্যা করে, তার গৃহে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরে থাকে সন্তান হারানো মায়ের মর্মভেদী আর্তনাদ। তবে 'যতি' নামক ঈশ্বরবিশ্বাসী, শান্তিপ্রিয় চরিত্রের মাধ্যমে কবি যেন নিজেকেই প্রতিস্থাপন করেছেন। নাটকের পরিশেষে দেখি, যতি গণনাথকে বাঁচানোর জন্য গণনাথের ছদ্মবেশ ধারণ করে, গণনাথও যতিকে চিনতে পারে ও আলিঙ্গন করে বলে-*"ভবানেব সত্যদর্শী নিঃস্বোऽপি নিঃসহায়োऽ জন-গাম-কল্যাণং কাময়ত,ভবানেব নিঃস্ববার্থঃ, অয়মেব ভারতীয়-ভাবমহিমা ।"*[৬৮]

সমালোচনা:

পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ দশকের শেষে এবং সাতের দশকের শুরুর দিকে এক বিকট পরিস্থিতির শুরু হয়। যা মূলত 'নকশাল আন্দোলন'[৬৯] নামে পরিচিত। এই 'নকশালবাদ' মূলত communist মতাদর্শে বিশ্বাসী। ল্যাটিন শব্দ 'communis' থেকে 'Communism' শব্দটির উৎপত্তি; যার বাংলা আভিধানিক অর্থ- 'সাম্য'। তবে সাম্যের নামে দিক্‌ভ্রান্ত ও বিপথগামী যুবসমাজকে দিশা দেখাতেই কবি এই রূপক রচনার অবতাড়না। একটি মাত্র

অঙ্কে তিনটি মুখসন্ধিতে বিভক্ত এই রূপকটি অঙ্গীরস করুণ। তবে অঙ্গরস হিসাবে ব্যঙ্গ্যাত্মক হাস্যরসকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৬.১২. সিন্ধু-সৌবীর সংগ্রামম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৬৬):

একাঙ্কের এই রূপকে নাটকের প্রয়োজনে যুদ্ধের ইতি ঘোষিত হলেও কবি ইঙ্গিত করেছেন- এ যুদ্ধ থামার নয়। নাটকে পাকিস্তানের সেনাপতি বলছেন- *"হা হা তদর্থমিদানীমপি তত্রাস্মাকম্ অবাধঃ অধিকারো বর্ত্ততেতরম্।"*[৭০]- 'কাশ্মীরে তো মুসলমানদেরই আধিক্য। সোজা বুদ্ধিতে দেখো কাশ্মীর তো আমাদেরই।'[৭১] ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সেনাপতি বলছেন- *"ভারতরাষ্ট্রে সমদৃষ্ট্যা হিন্দু-মাহম্মদ-বৌদ্ধ-জৈন কৈস্তবানাং স্থিতিরস্ত্যেব।"*[৭২]- ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রের প্রতি লোভ নেই, তবে নিজ রাষ্ট্রে অপরের হস্তক্ষেপও তারা সহ্য করবে না-*"মিত্র। পুনরপি ভণামি- বয়ং শান্তিকামা অপি অহিংসা-মন্ত্র-সাধকা অপি পরাক্রমণ-প্রতিরোধায় স্বরাষ্ট্র-রক্ষণায় চ মৃত্যুপণে সন্নদ্ধাঃ স্ম।"*[৭৩]

সমালোচনা:

সিন্ধুপ্রদেশ ও সৌবীর অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে 'POK' বা পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে যে সমস্যা অদ্যাপি বর্তমান- সেই বিষয়টিই এই রূপকের উপজীব্য। কবির এই নাটক রচনাকাল মোটামুটি সাতের দশকের শেষভাগে। স্বাধীনতা পরবর্তী এ সমস্যা যেন মিটবার নয়, ক্রান্তদর্শী কবি যেন তা জানতেন।

৬.১৩. দরিদ্রদুর্দৈবম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৮):

দরিদ্রদুর্দৈবম্[৭৪] প্রহসনটির নায়ক বক্রেশ্বর ও নায়িকা তার স্ত্রী মন্দোদরী (দ্বিতীয়া স্ত্রী), এছাড়াও তাদের দুই পুত্র- লম্বোদর ও ষড়ানন; কৃপণ ধনী বণিক ক্ষুদ্ররাম, সিদ্ধ ও সিদ্ধা-এরাই রূপকটির পাত্রপাত্রী। প্রৌঢ় বক্রেশ্বরের একটি কুঁড়েঘর অবলম্বন; ভিক্ষাবৃত্তিই তার জীবিকা। কিন্তু গৃহে স্ত্রীকে সে দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যটুকু দিতে না পারলেও গঞ্জনা দিতে ত্রুটি রাখেনা। ভিক্ষুক বক্রেশ্বর ভিক্ষা চেয়েও পাচ্ছে না, সমাজে দুর্ভিক্ষের এক নিদারুণ অবস্থা। এই প্রসঙ্গে সে বলেছে-

"ভিক্ষাপি দুর্লভা জাতা শিক্ষা ধর্মময়ী গতা।
সর্বত্র তু তিরস্কারঃ পুরস্কারোঽর্থিনামহো!"[৭৫]

সমালোচনা:

ভিক্ষা না পাওয়ার দুটি অর্থ হয়; সমাজের আর্থিক দৈন্যতা, না হয় মানসিক দীনতা। বক্রেশ্বরের পুত্ররাও আর পড়াশোনা করছে না, তারাও ভিক্ষাকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। শিক্ষার এক বেহাল দশা এই প্রহসনে ফুটে উঠেছে। ১৯৬৮ সালে *সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ* থেকে এই প্রহসনটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

৬.১৪. শ্রীকৃষ্ণকৌতুকম্ (সংস্কৃত প্রতিভা, ১৯৬৯):

একটি অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়াধারে রচিত *শ্রীকৃষ্ণকৌতুকম্*[৭৬] -এই নাট্য শৃঙ্গার রসাশ্রিত প্রহসনটির অঙ্গরস হাস্য। শ্রীজীব এই প্রহসনটির বঙ্গানুবাদও সম্পন্ন করেছেন।[৭৭]

সমালোচনা:

নাট্যকার এই রূপকটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সারস্বত উৎসবে মঞ্চস্থ হবার উদ্দেশ্যে রচনা করেন। মূল সংস্কৃত নাটকটি সাহিত্য একাডেমী থেকে 'সংস্কৃত-প্রতিভা' নামক একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৮]

৬.১৫. নষ্টহাসম্ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯৮):

নষ্টহাসম্[৭৯] প্রহসনের শুরুতেই দেখা যায়, 'লোকপ্রিয়া' নামক নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যকুশীলবগণ, *'মাধুরীসুন্দরম্'* নাটকে মাধুরী চরিত্রটি কে অভিনয় করবে- তা নিয়ে আলোচনা করছে। চিন্তার বিষয় এটিই যে, সকলেই তারা পুরুষ সভ্য; যথা- সুনন্দ, রসিকেন্দ্র, শুভেন্দু, রঙ্গস্বামী, মণিমোহন, শঙ্কর, গণপতি ও প্রিয়ংবদ (সুন্দর চরিত্রাভিনেতা) । নারীচরিত্রের জন্য কোনো নটীকে আহ্বান করলে তাকে তো কিছু দক্ষিণাও দিতে হবে! নাটকটি বাদ দেওয়া হোক এমনই শঙ্করের মত- *"সুপ্রচুরা দক্ষিণা দাতব্যা । মাধুরীসুন্দরং নাম রূপকং পরিত্যজ্যতাম্ ।"*[৮০] সুনন্দ তখন শঙ্করকেই মাধুরী চরিত্রটি অভিনয় করতে অনুরোধ করে। কিন্তু গণপতিসহ অন্যান্য *সদস্যরা তাতে গররাজি। শৃঙ্গার রসের নাটকের সম্যক প্রকাশ ঘটে নারীচরিত্রের দ্বারাই। নাটকে* শৃঙ্গার রসের স্থান, প্রাণীর কাছে প্রাণবায়ুর মতো- *"শৃঙ্গার এবাদিরসঃ । রস্যপরিহারঃ প্রাণবায়ুবর্জনমিব প্রাণিনাম্ ।"*[৮১] কিন্তু দক্ষিণা দিয়ে চরিত্রাভিনেত্রী পেতেও কম করে দশ টাকার মতো খরচ! শঙ্কর খুব জোর পাঁচ টাকা দিতে রাজি। রসিকেন্দ্র তখন বলে– *"পঞ্চমুদ্রাবিনিময়েন ভৃত্যভূমিকা লব্ধব্যা । নায়কস্য শরীরসংবাহনাদিকর্মণি সদা সন্নদ্ধেন স্থাতব্যম্ ।"*[৮২] এই সময় চিত্তচমৎকারিণী নামের এক নটী পাঁচশো টাকা দক্ষিণা চেয়ে বসেন-*"...স্বদেশে কিয়দ্বাকথয়ামি দীয়তামার্দ্ধসহস্রম্ ।"*[৮৩] কেননা তিনি বিমানযোগে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করেন। অভিনয়ের জন্য সহস্রমুদ্রা তিনি নিয়েই থাকেন। এতে গোলযোগের সৃষ্টি হলে সেই নটী প্রস্থান করেন। এরপর আরেক নটী পাওয়া গেল, নাম তার মাধুরী। দক্ষিণা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

> *"যথাশক্তি যথাযুক্তি ভবদ্ভিরূপকল্প্যতাম্ ।*
> *সবনস্যেব নাট্যস্য ন বাচ্যা দক্ষিণা স্বয়ম্ ।।"*[৮৪]

রঙ্গস্বামীও মাধুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন। এভাবে একরকম সমস্যার সমাধান হলে সূত্রধার প্রবেশ করেন। এবার নাটক মঞ্চস্থ হবে। ঠিক তখনই রাজবল্লভ ও গুপ্তচর হাজির হন এবং মাধুরীকে রাজকন্যা বলে দাবী করেন। এমন সময় পলায়দ্যোত মাধুরীর অবগুণ্ঠন সরানো হলে দেখা যায়, এ তো শঙ্কর! সুন্দরবেশী প্রিয়ংবদ তার কাছে এবিষয়ে জানতে চায়- *"কথয় মাধুরীসংলাপলোলুপং মাং কথং বঞ্চয়সি?"*[৮৫] প্রত্যুত্তরে শঙ্কর বলে, বর্ষকালব্যাপী জমানো টাকা যা নারীচরিত্রের দক্ষিণাস্বরূপ সেটিই তার উদ্দেশ্য- *"গৃহ্যতাং মুদ্রাশতকং বর্ষসঞ্চিতং ভবদীয়গৃহভাটকম্ । যতো ময়া স্বীকৃতা নায়িকা ভূমিকা অতো ময়ৈব দানবীরত্বম্ প্রদর্শ্যতে ।"*[৮৬]

সমালোচনা:

একাঙ্ক এই প্রহসনটিতে নাট্যশালার কুশীলবদের আর্থিক ও মানসিক দৈন্যতা তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যতথ্য সমন্বিত এই প্রহসনে নাটকের নট, রঙ্গশালা প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক বিষয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়াও *রাম-নাম-দাতব্য চিকিৎসালয়ম্* (প্রণব পারিজাত, ১৯৬৫) ও *বনভোজনম্* (প্রণব পারিজাত, ১৯৬৬) নামক প্রহসনদুটি শ্রীজীব ভট্টাচার্যের রচনা। উপরিউক্ত প্রহসনগুলি রচনার দ্বারা কবি শ্রীজীব নাট্যকার তথোপরি প্রহসনকার রূপে নিজের পৃথক পরিচয় প্রদান করেছেন। অধ্যাপক যাদবেন্দ্র রায় কবিকে 'প্রহসনরসিক' বলে অভিহিত করেছেন- *"...শ্রীজীব ন্যায়তীর্থং প্রহসনরসিকং জ্ঞানমূর্তিং নমাম ।"* -এর থেকে অনুমিত হয় যে, তাঁর রচিত প্রহসনগুলি পৃথকভাবে পাঠকসমাজে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছিল। প্রায় প্রতিটি প্রহসনেই তিনি নাট্যতত্ত্বের নিয়ম-রীতিকে মান্যতা দিয়েও নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যহত রেখেছেন।

স্তোত্রকাব্য:

প্রশংসাসূচক কাব্যমাত্রই স্তোত্রকাব্য। শ্রীজীব কর্তৃক প্রশংসাসূচক কাব্যগুলিকে অর্থাৎ দেব-দ্বিজের প্রতি স্তবকে স্তোত্রকাব্য এবং মানবের প্রশংসাসূচক স্তবগুলিকে প্রশস্তিকাব্য নামে পৃথক করা হয়েছে।

স্তবকুসুমমালিকা:

স্তবকুসুমমালিকা[৮৭] পুস্তকটি মূলত শ্রীজীব রচিত স্তব বা স্তোত্রের সংকলন গ্রন্থ। মোট ৭২টি স্তোত্র রয়েছে এতে। যেমন– *শ্রীসূর্য্যদ্বাদশকলিকাস্তবঃ, গায়ত্রীমহিম্নঃ স্তোত্রম্, শ্রীগুরুবন্দনম্, শ্রীশ্রী সরস্বতীস্তুতিগীতিঃ, শ্রীনারায়ণ-স্তুতিমঙ্গলম্, শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদন-স্তুতি-গীতি, শ্রীদুর্গাস্বাগত-স্তোত্রম্, শ্রীশ্রীদুর্গাস্তুতিগীতিঃ, শ্রীজন্মাষ্টমী ধ্যানম্, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীতিথৌ বহুদেবপ্রার্থনম্, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীতিথৌ শ্রীভগবদাবাহম্, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীতম্, রাসবিলাস প্রার্থনম্, শ্রীরাসবিলাসম্* ইত্যাদি।

সমালোচনা:

মূল সংস্কৃত ছাড়াও বঙ্গানুবাদ যুক্ত এই স্তোত্র গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়কে উদ্দেশ্য করে স্তোত্র, যেমন- দেবদেবীর স্তুতিমূলক, বিশেষ তিথির স্তুতিমূলক, দেশ বন্দনা মূলক ইত্যাদি।

প্রশস্তি কাব্য:

শ্রীজীব তাঁর সমকালীন সকল সম্মানীয় ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করেই প্রশস্তি রচনা করতে সচেষ্ট ছিলেন। যেমন- রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে মাত্র সাতটি স্তবকে রচনা করলেন *'রবীন্দ্রনাথ-প্রশস্তিঃ'*[৮৮], *'দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রশস্তিঃ'*, তিনটি স্তবকে *'শ্রীঅরবিন্দপ্রশস্তিঃ'*[৮৯], *'সংগীতাচার্যদিলীপকুমার রায়-প্রশস্তি'*[৯০], *'সুবর্ণজয়ন্তী প্রশস্তিঃ'*[৯১], *'সুভাষচন্দ্র প্রশস্তিঃ'*[৯২], *মহামহোপাধ্যায় প্রমথতর্কভূষণের উদ্দেশ্যে 'স্মৃতিপূজনম্'*[৯৩], *'আশুতোষশাস্ত্রিস্মৃতিপূজনম্'*[৯৪], *'অভিনন্দনম্', 'শুভপ্রশস্তিগাথা', 'হৃদয়োচ্ছ্বাস', 'উৎসবস্য দিবসঃ (রবীন্দ্রস্য)'* উল্লেখযোগ্য।

সমালোচনা:

'সুনীতিকুমার প্রশস্তিঃ'তে[৯৫]- কবি শ্রীজীব 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ'-এর তৎকালীন সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক, 'পদ্মভূষণ' সম্মানে বিভূষিত ৭৭বছর বয়সী অধ্যাপকের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রশস্তির সুরে বলেছেন-

"বহুবিধভাষা-বারস্ত্রীভিঃ শোভিতকণ্ঠো ভাববতীভিঃ ।
সপ্তগসপ্ততিবৎসরপারো ভাসি তথাপি সুনীতিকুমারঃ ।।"[৯৬]

এছাড়াও জানকীনাথ শাস্ত্রীর রাষ্ট্রপতি সম্মানে সম্মাণিত হওয়ায় তাঁর উদ্দেশ্যে লেখেন- *'পণ্ডিত-বরেণ্য-শ্রীজানকীনাথ-শাস্ত্রী-মহাদয়ানাং রাষ্ট্রসম্মানপ্রাপ্তৌ সশ্রদ্ধমভিনন্দনম্'* -যেখানে শ্রীজীব তাঁর *জানকীনাথ* -নামটিকে সভঙ্গ শ্লেষরূপে শ্লোকে ব্যবহার করেছেন-

"কুশলবসুতা-বিরহেঽপি বিভাতি যঃ শ্রীল জানকীনাথঃ ।
পুমানপি বিপুলমানঃ পৃথ্ব্যাং প্রথতে স্বয়ং শাস্ত্রী ।।"[৯৭]

কুশল-বসুতা অর্থাৎ ধনবতী লক্ষ্মীরূপী সীতা অথবা লব-কুশ যাঁর সুত সেই সীতা বা জানকীর যিনি বিরহী তিনিই তো সেই জানকীনাথ!

বিলাপ গাথা:

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রণীত বিলাপকাব্য গুলি নিম্নে আলোচিত হল-

ন্যায়ধীশবিয়োগ বিলাপ:

বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের[৯৮] মহাপ্রয়াণে শ্রীজীব প্রণীত এই কাব্যবিশেষটি মোট **১০**টি শ্লোকে বিচরিত।[৯৯] কাব্যটির অষ্টম শ্লোকে কবি, বিচারপতি বিজন মুখোপাধ্যায়ের অনিন্দ্যকান্তি তনুর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এইরূপে- *"রূপং ভূপোচিতমপি মুখং ফুল্লরাজীবতুল্যং*

দাক্ষিণ্যং তে দিনকৃত ইবাক্ষীণমাসাপ্রসারি ।
ক্রমং চেতঃ কুসুমসদৃশং যত্তমাপি প্রতীপঃ
পুত্রস্নেহং প্রিয়জনগণং হা কথং বা জহাসি ।।"[১০০]

-রাজার মতো যার দেহাবয়ব, পদ্মের মতো মুখমণ্ডল, দাক্ষিণ্যে যিনি কুসুমসদৃশ সেই প্রিয়জনের প্রতি পুত্রস্নেহকারীকে আর কোথায় পাব!

সমালোচনা:

এই কাব্যে চতুর্থ শ্লোক ভিন্ন অপর শ্লোকগুলি মন্দাক্রান্তা ছন্দে গ্রথিত। চতুর্থ শ্লোকটি বিষমবৃত্ত। মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবির সাবলীলতা অত্যন্ত চিত্তহারিণী।

বিলাপগাথা:

বিদ্বন্মুকুট অনন্তকুমারতীর্থ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে রচিত হয় এই বিলাপগাথা।[১০১] প্রথম শ্লোকটি এরূপ-

"হা হা! তর্কাম্বুধিরনবধিঃ শোষিত কেন রোষা
চ্চূডা ন্যায়াচলপরিচিতা চূর্ণিতা কেন তূর্ণম্ ?
সূরো দুর্দ্যুতিবিতরমাত্ কাতরো ধ্বান্তপূর-
চ্ছন্নো লোকান্তরমপি গতো হন্ত! সার্থঃ কৃতান্তঃ ।"[১০২]

সমালোচনা:

শ্লোকষ্টকে রচিত এই কাব্যটিতে দুটি ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা; প্রথম-তৃতীয়-চতুর্থ ও সপ্তম শ্লোক শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ছন্দে এবং দ্বিতীয়-পঞ্চম-ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দে গ্রথিত। এমত দুটি ছন্দের উদাহরণ নিম্নে আলোচিত হল।

বিলাপ:

পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের[১০৩] মহাপ্রয়াণে রচিত এটি *বিলাপঃ* নামক কাব্যটি শ্লোকষ্টকে ও বসন্ততিলক বৃত্তাবৃত।

সমালোচনা:

কাব্যটির দ্বিতীয়-তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক সন্দানিতক ও তদ্ভিন্ন শ্লোকগুলি মুক্তক শ্রেণীর। চতুর্থ শ্লোকেই দ্বিতীয় থেকে উল্লিখিত একটিমাত্র ক্রিয়াপদ বর্তমান।

এছাড়াও পণ্ডিত প্রকাণ্ড লক্ষণ শাস্ত্রীর[১০৪] প্রয়াণে *'শোকঃ';* ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে মাত্র সাতটি স্তবকে তাঁর ঋষিতুল্য গুণাবলী, শুষ্ক ব্যাকরণশাস্ত্রকে সরসভাষায় উপস্থাপন, তাঁর নিজ অর্থব্যয়ে *'মঞ্জুষা'* পত্রিকার সম্পাদনা-সকল কিছুরই বিবৃতি প্রদান করেছেন। ডঃ গোপিকা মোহন ভট্টাচার্যের[১০৫] মৃত্যুতে *'ডঃ গোপিকা-মোহন-বিয়োগ-বিরহগাথা'* রচনা করেন।

প্রবন্ধ-রচনা:

শ্রীজীবের অধিকাংশ প্রবন্ধই গবেষণাধর্মী। তাঁর পি.এইচ.ডি'র গবেষণাটি অর্থাৎ *'Antiquity of the Nyaya Sutra'* প্রবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Research Journal *'অন্বীক্ষা'* তে ইংরাজী ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২-এ নিউ দিল্লীতে আয়োজিত 'বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনে' তিনি একটি নিবন্ধ (report) রচনা করলেন। সেই নিবন্ধে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি.ভি.গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগিতার কথা কিংবা সভাপতি ডঃ ভি.রাঘবনের সংস্কৃতে বক্তৃতার কথা; বালি-ইন্দোনেশিয়া-জার্মানি-ভিয়েনা-ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স-ইউ.এস.এ-কানাডা-হাঙ্গেরি-পোল্যাণ্ড প্রভৃতি বিদেশের বিদ্বত-প্রতিনিধিদের প্রবন্ধপাঠ এবং পণ্ডিত পরিষদের কথা- যা সংস্কৃত সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। আবেগাপ্লুত শ্রীজীব স্রগ্ধরা ছন্দে তাই লিখলেন-

> *"যা ভাষা ভাতি ভাসা পরমরসময়ী ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিতা ।*
>
> *প্রাচীনাপি স্বভাবাচ্চিরতরুণতয়া বারুণীব প্রিয়শ্রীঃ ।*
> *বিশ্বেষাং মানবাং মনসি বিদধতি ভাবসম্পত্তিভারং*
>
> *সেয়ং শ্রীভারতী সংসকৃতমিতি সুভনামাস্তু সম্যক স্তুতাদ্যা ।।"* [১০৬]

'পশ্চিমবঙ্গীয়ং কিঞ্চন চিত্রম্' নামক রম্যরচনায় সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গে সকল চিত্রই যেন তাঁর এই রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রের মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের লড়াই বর্ণিত হয়েছে তেমনি ছাত্রসমাজের বিশৃঙ্খলা, গণটোকাটুকি করে পরীক্ষা- কোনো বিষয়টিই বাদ যায়নি। *'কিঞ্চন শঙ্কাসমাধানম্'* নামক রচনাতে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের মতামত ব্যাখ্যা যুক্তির সাহায্যে নবীন-প্রবীনমতে তুলে ধরেছেন।

সমালোচনা:

এ ব্যতীত শ্রীজীব রচিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলি হল- *সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসন* (মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় প্রকাশিত), *বঙ্গদেশে দর্শনচর্চা* (বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পঠিত ও *গাঙ্গেয়* পত্রিকায় প্রকাশিত), *পিতৃস্মৃতি* (উজ্জীবন পত্রিকা, ১৯৭৫), *আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন* (*পথের আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত; বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), *টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরী* (*হিমাদ্রী* পত্রিকা, শারদীয়া সংকলনে প্রকাশিত), *নবদুর্গার আহ্বান* (*বসুমতী* পত্রিকার শারদ সংকলনে প্রকাশিত), *দুর্গাপূজা ও প্রাণাত্মবাদ* (*হিমাদ্রী* পত্রিকা, শারদীয়া সংকলনে প্রকাশিত), *আমার কথা* (নৈহাটির স্থানীয় 'উপনগর' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত), *প্রাচীন পল্লীচিত্র* (অপ্রকাশিত, পাণ্ডুলিপিতে অবস্থিত)। তাঁর *বিল্হনের চৌর পঞ্চাশিকা* এবং *চরকদর্শন* – নামক রচনা দুটি কলকাতা থেকে বেতারে পঠিত হয়েছিল।

অনুবাদ রচনা:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১০৭] রচিত *'ধর্ম'* শিরোনামে কয়েকটি ছোট-বড় প্রবন্ধ যেমন- *ধর্মপ্রচার, বর্ষশেষ, উৎসবের দিন, দুঃখ* -ইত্যাদির সংস্কৃত অনুবাদ[১০৮] এবং পাশ্চাত্যের যশস্বী কবি William Wordsworth[১০৯]-এর *'By the sea'*[১১০] নামক কাব্যটিকে *'সায়ং সিন্ধুতটে'*[১১১] নামে সংস্কৃতে অনুবাদিত করেন।

অন্যান্য রচনা:

শ্রীজীবের নামে আরও কিছু রচনার কেবল নামমাত্র প্রাপ্ত হয়ে থাকি। এগুলি হল- *দ্বিজদূতম্* (দূতকাব্য), *যোগ্যযুগলমেলকম্* (প্রহসন), *শ্রী শ্রী সীতানাথ দাসোঙ্কারনাথ-চারু চরিতম্* (৪ সর্গাত্মক মহাকাব্য), *জাতিস্বরূপোদ্ঘাটনম্, দ্বৈতোক্তি রত্নমালা, 'The other world mother', 'প্রবচনপারিজাত'*[১১২]। পিতা পঞ্চাননের সম্পাদনায় অষ্টাদশ পুরাণসহ অন্যান্য সংস্করণগুলি -যেগুলি নবভারত পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে; তার প্রতিটিই শ্রীজীবের দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়েছে; যেমন- *দেবীভাগবত* (১৯৮১), *দেবীপুরাণ* (১৯৭৭),

কূর্মপুরাণ (১৯৮৭), *মৎস্যপুরাণ* (১৯৮৭), *মার্কেণ্ডেয় পুরাণ* (১৯৮২), *বিষ্ণুপুরাণ* (১৯৮৩), *কালিকাপুরাণ* (১৯৭৬) ইত্যাদি।

পরিশেষে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পুরাণ ও দর্শনের অগাধ জ্ঞান, ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রের বিষয়ে পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতের নমনীয়-মাধুর্য্যবোধ ও ইংরাজী সাহিত্যে প্রখর দক্ষতা শ্রীজীবকে রচনাক্ষেত্রে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছিল। তার ফলস্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষভাবে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য এক সুবিশাল রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে। শ্রীজীব, তাঁর পিতৃ-পিতামহের চিরায়ত শাস্ত্রানুশীলনরূপ মহান ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। নিঃস্বার্থ ও অনসল প্রয়াসে শাস্ত্রচর্চার প্রদীপটিকে তিনি অত্যন্ত সমাদরের সাথে সগৌরবে রক্ষা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন নিজের অন্তর্জগতে, যার বহির্প্রকাশের বিচ্ছুরণ ঘটেছে তাঁর কাব্যের মাধ্যমে। ভারতীয় শাস্ত্রের এমন কোনো শাখা নেই, যার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তিনি স্বচ্ছন্দে ও অবলীলাক্রমে বিচরণ না করতে পারেন। তিনি সাধক মানুষ, অধ্যয়ণ-অধ্যাপন তাঁর তপস্যা। নিজ বিষয় ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর কি গভীর প্রেম! কি নিরলস প্রচেষ্টা আর্ষগণের সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের তরে! শতবর্ষের জীবদ্দশায় তিনি অনেক কিছুরই প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। দেখেছেন দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আন্দোলন- সমাজের উত্থান-পতনের ভয়ঙ্কর সাক্ষ্য তাঁর জীবনে বহু। ব্রিটিশ শাসন যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনই পেয়েছেন স্বরাজ অর্জনের আনন্দ- সত্যই তিনি এক সৌভাগ্যবান পুরুষ। সেই সকল সময়ের প্রতিচ্ছবিকে তিনি তাঁর লেখনীতে সংস্কৃত সাহিত্যে জীবন্ত করে রাখতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি ইংরেজদের কূটনীতিকে সরাসরি তাঁর লেখায় ব্যঙ্গ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পথিকৃৎ-ব্যক্তি। তাঁর লেখায় রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, মূল্যবোধের অবক্ষয় বা সভ্যতার সংকট সবকিছুই উঠে এসেছে। সর্বোপরি স্থান পেয়েছে তাঁর রচিত প্রহসনগুলি- যা কেবল সুবিমল হাস্যরসের পরিবেশক নয়; মিষ্টভাষী শ্রীজীব যেন এগুলির মাধ্যমেই দর্শক-পাঠককে কশাঘাত করেছেন। নিজের দেশ, নিজের মাটি- তার রক্ষা, নিজের সংস্কৃতি, নিজের ভাষা, নিজের মনুষ্যত্ববোধ বাঁচানোর আকুতিই যেন হাসির ছলে, শাসনের সুরে, কখনো বা তীব্রভাষায় বলতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি:

[১] *ভট্টপল্লীর এক প্রতিবাদী আচার্য শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ*, পৃ.৬৩। কমলচরণ মুখোপাধ্যায়,*'স্মরণীয় তাঁরা'*, আন্ডারগ্রাউণ্ড সাহিত্য, চন্দননগরঃ ২০০৪।

[২] রা.বি., ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *রূপকচক্রম্*, শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফাঃ ১৯৭২, পৃ. ১।

[৩] *ভট্টপল্লীর এক প্রতিবাদী আচার্য শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ*, পৃ.৬৩। কমলচরণ মুখোপাধ্যায়,*'স্মরণীয় তাঁরা'*, আন্ডারগ্রাউণ্ড সাহিত্য, চন্দননগরঃ ২০০৪।

[৪] সেন, শক্তিপ্রিয়, *'আমাদের কথা'*, নৈহাটী নাগরিক সংবর্ধনা কমিটি পত্রিকা, নৈহাটী নাগরিক সংবর্ধনা কমিটি, নৈহাটীঃ ১৯৮০।

[৫] তদেব।

[৬] *'ভট্টপল্লীর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সহধর্মিণী সুনীতি দেবী'*, পৃ. ৭৫। কমলচরণ মুখোপাধ্যায়,*'ভট্টপল্লীর মনীষী'*, আন্ডারগ্রাউণ্ড সাহিত্য, চন্দননগরঃ ২০০২।

[৭] অঞ্জলি বসু, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* (দ্বিতীয় খণ্ড), শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা.লি., কলকাতা। পৃ. ৩৪১।

[৮] ৮.৮.৩৪-৮.৮.৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। Wikipedia: 29.05.25; 08.01 p.m.

[৯] 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যোগমায়া দেবীর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে শিক্ষাবিদ্‌, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজকর্মী ও ভারতীয় ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি বঙ্গের বিধানসভার সদস্য (১৯২৯-১৯৪৭), বঙ্গপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী (১২.১২.৪১-২০.১১.৪২) স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী (১৫.৮.৪৭-৬.৪.৫০), ভারতের নির্বাচন কমিশনের সদস্য (৯.১২.৪৬-২৪.১.৫০) ছিলেন। তিনি ১৯৫১-৫২ সালে 'ভারতীয় জন সংঘ' নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

[১০] অধ্যাপক গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় (২৩.৫.১৯১৮-২৬.৩.২০০৯) ছিলেন রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত সংস্কৃত পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের গবেষক-ছাত্র এবং তাঁর খ্যাতনামা শিষ্যরা হলেন- ভারতরত্ন এম.এস.শুভলক্ষ্মী, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

[১১] রত্না চক্রবর্তী ছিলেন ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের শিষ্যা-কন্যা। পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। তাঁদের সঙ্গীতের একটি ক্যাসেটও বর্তমান।

[১২] রায়, যাদবেন্দ্র, *'সশ্রদ্ধাভিবন্দনম্‌', নৈহাটী নাগরিক সংবর্ধনা কমিটি পত্রিকা,* নৈহাটী নাগরিক সংবর্ধনা কমিটি, নৈহাটীঃ ১৯৮০।

[১৩] শ্রীজীব ভট্টাচার্য, *'পাণ্ডববিক্রমম্‌',* জানকীজীবন ভট্টাচার্য, শ্রী জগদ্ধাত্রী প্রেস, কলকাতা: ১৯৮৫।

[১৪] তদেব, পৃ. ১।

[১৫] টীকা অংশে, পৃ. ১।

[১৬] তদেব ১/৩; পৃ. ২।

[১৭] তদেব ১/৫।

[১৮] তদেব ১/৩০; পৃ. ১৭।

[১৯] তদেব।

[২০] তদেব ১/২২। পৃ. ১৬।।

[২১] তদেব, শ্লোক সংখ্যা ৯৮, পৃ. ৮৬।

[২২] তদেব। শ্লোক সংখ্যা ৫৪, চিত্র সংখ্যা ২৫; পৃ. ২৬।

[২৩] কা.প্র. ৬/১, পৃ.-৩৯। মম্মট, *কাব্যপ্রকাশ,* রামানন্দ আচার্য (সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতাঃ ১৪০৪ (বঙ্গাব্দ)। এই চিত্রকাব্য আবার দ্বিবিধ; ক) শব্দচিত্র এবং খ) অর্থচিত্র।

[২৪] শ্রীজীব, *সারস্বতশতকম্‌* (চিত্রকাব্যম্‌), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতাঃ ১৯৬৫।

[২৫] *বসন্তবর্ণনা,* শ্লোক সংখ্যা-১; পৃ. ২১১। ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *'ঋতুচক্রচঙ্‌ক্রমণম্‌',* সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৬২তম সম্ভার, কলকাতাঃ ১৯৮০।

[২৬] তদেব। শ্লোক সংখ্যা ৪,

[২৭] তদেব। শ্লোক সংখ্যা ১০; পৃ. ২১৪।

[২৮] তদেব, বর্ষাবর্ণনা, শ্লোক সংখ্যা ১; পৃ. ২১৪।

[২৯] তদেব, শরৎবর্ণনা, শ্লোক সংখ্যা ৯; পৃ. ২১৭।

[৩০] তদেব। হেমন্তবর্ণনা- ১শ্লোকের পূর্বভাগ, পৃ. ২১৭।

[৩১] তদেব। হেমন্তবর্ণনা- ৫ শ্লোক, পৃ. ২১৯।

[৩২] তদেব। শীতবর্ণনা-১০শ্লোক, পৃ. ২২০।

[৩৩] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *‘পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সারস্বত সাধনা’*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতাঃ ১৪১১ (বঙ্গাব্দ)। পৃ. ১১।

[৩৪] কা.সূ.বৃ. ১/৩/৩০; পৃ. ৫৪। বামন, *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ*, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সদেশ, কলকাতাঃ ২০১২।

[৩৫] সা.দ. ৬/৬, পৃ. ৩। বিশ্বনাথ, ‘*সাহিত্য দর্পণ*’, উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতাঃ ২০১২।

[৩৬] ম.কা.; ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *রূপকচক্রম্*, শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফাঃ ১৯৭২, পৃ. ১-৪০।

[৩৭] তদেব।

[৩৮] ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উজ্জয়িনী শহরে প্রতিবছর সাতদিনের জন্য মহাকবি কালিদাস সহ অন্যান্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয় -যা ‘অখিল ভারতীয় কালিদাস সমারোহ’ নামে পরিচিত।

[৩৯] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব,*‘শ্রীশঙ্করাচার্য-বৈভবম্’*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫১, ৫২, ৫৭, ৬৪, ৬৭তম সম্ভার, কলকাতা।

[৪০] মহারাষ্ট্রের স্বনামধন্য ভক্ত, কবি ও সাধক ছিলেন তুকারাম। তাঁর জীবনের সময়কাল ১৬০৮ থেকে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। ক্ষমা রাও তুকারামের জীবনাবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। পরে লীলারাও দয়ালু নামক ব্যক্তি ঐ কাব্যের নাট্যরূপ প্রদান করেন। এটি একাঙ্কের রূপক।

[৪১] মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত কবি, ভক্ত তথা দার্শনিক জ্ঞানদেবের সময়কাল ১২৭৫-১২৯৬, এরূপ মনে করা হয়। তাঁরই জীবনী নিয়ে ক্ষমা রাও প্রথমে কাব্য রচনা করেন, যা ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। মোট ১৪টি দৃশ্যের এই রূপকটির নাট্যরূপ প্রদান করেন লীলারাও দয়ালু।

[৪২] বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি কবি এস.বি.বর্ণেকরের কবিমনকে প্রভাবিত করেছিল। দশটি অঙ্কে রচিত ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে অনবদ্য নাটক এটি।

[৪৩] বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সমূলরের সারস্বত সাধনাকে উপজীব্য করে ভবানী শঙ্কর ত্রিবেদী ১৯৮১ সালে এই নাটকটি রচনা করেন।

[৪৪] যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী প্রণীত দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) জীবনাশ্রয়ে রচিত নাটকটি ১৯৭২ সালে প্রকাশ পায়।

[৪৫] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতাঃ ২০২২, পৃ. ২০২।

[৪৬] উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূলত বিষ্ণুপুর ঘরাণার কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন- যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্য। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মল্লভূমে অর্থাৎ অধুনা বাংলার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য পাড়ায় ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য ছিলেন রাজা নীলমণি সিংহের সভাগায়ক তথা ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। পিতার কাছেই তাঁর গীতশিক্ষা শুরু, এরপর ক্রমে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আচার্যগণের কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা সম্পন্ন হয়। সম্মাননা স্বরূপ পঞ্চকোটের রাজা তাঁকে ‘রঙ্গনাথ’ এবং ত্রিপুরারাজ কর্তৃক তিনি ‘তানরাজ’ উপাধিতে ভূষিত হন। কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়াও যদুভট্ট বীণা, সুরবাহার, সেতার, সরোদ, সুরশৃঙ্গার, মৃদঙ্গ, এসরাজ, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনে দক্ষ ছিলেন। ১৮৮৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল এই মহান সঙ্গীতজ্ঞের জীবনাবসান ঘটে।

[৪৭] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *পুরুষপুঙ্গবঃ*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সম্ভার ৪৩, কলকাতা, পৃ. ১৭৯।

[৪৮] মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা চতুর্বেদী (১৮৮১-১০.৬.১৯৬৬) ছিলেন রাজস্থানের এক খ্যাতনামা পণ্ডিতজন। তাঁর পিতা ছিলেন গোকুল চন্দ্র চতুর্বেদী এবং মাতা লবঙ্গী দেবী। তিনি বেদবিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিত মধুসূদন ওঝার ছাত্র ছিলেন। ১৯০৮ সাল থেকে তিনি অধ্যাপন-কার্যের সাথে যুক্ত হন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি সর্বপ্রথম 'বাচস্পতি' (ডি.লিট.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন।

[৪৯] সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তক পত্রিকা; সম্ভার ৯, পৃ. ১-৪।

[৫০] তদেব।

[৫১] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *'পুরুষরণীয়ম্'*, জানকীজীবন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, কলকাতাঃ ১৯৪৯।

[৫২] চ.তা., পৃ. ১৬৭। ভট্টাচার্য, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, *'চণ্ডতাণ্ডবম্'*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৭ তম সম্ভার, কলকাতা: ১৯৫২। ১৯৫৩।

[৫৩] তদেব, পৃ. ১৬৯।

[৫৪] তদেব।

[৫৫] সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৮ তম সম্ভার, কলকাতা: ১৯৫৩, পৃ. ৫। ।

[৫৬] তদেব।

[৫৭] তদেব, পৃ. ২৯।

[৫৮] তদেব পৃ. ৩০।

[৫৯] *রূপকচক্রম্*, পৃ. ৭১-৮৫

[৬০] তদেব, পৃ. ৬৩।

[৬১] তদেব, শ্লোক সংখ্যা ২৫; পৃ. ৮৪।

[৬২] *'চিপিটকচর্বণম্'*, পৃ. ৪১-৬২। ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *'চিপিটকচর্বণম্'*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৮৯ তম সম্ভার), কলকাতা: ১৯৯৮। পৃ. ৪১-৬২।

[৬৩] *রূপকচক্রম্*, পৃ. ১-২০।

[৬৪] তদেব; পৃ. ৭।

[৬৫] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব,*'বিবাহ বিড়ম্বনম্'*, সংস্কৃত প্রতিভা, (তৃতীয় উন্মেষ, প্রথম বিলাস), সাহিত্য একাডেমি, নবদেহলী: ১৯৬১।

[৬৬] পৃ. ৯৯-১০১। পাদটীকা ১৪৭ দ্রষ্টব্য।

[৬৭] তদেব।

[৬৮] তদেব।

[৬৯] নকশাল বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৯৬৭ সালের ২৫ শে মে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে। গ্রামের কৃষকদের উপর স্থানীয় ভূস্বামীরা ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে অত্যাচার করছিল, বিরক্ত ও উত্যক্ত কৃষকগণ এর চরম প্রতিশোধ নেয় ঐ ভূস্বামীদেরই উৎখাত করে। এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন- চারু মজুমদার (১৫.৫.১৯১৮-২৮.৭.১৯৭২); যিনি চৈনিক বিপ্লবী মাও সে তুং -এর মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

[70] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতাঃ ২০২২, পৃ.১০২।

[৭১] তদেব।

[৭২] তদেব।

[৭৩] তদেব।

[৭৪] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *'দরিদ্রদুর্দৈবম্'*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা: ১৯৯৮।

[৭৫] তদেব।

[৭৬] তদেব।

[৭৭] ন্যায়তীর্থ, শ্রীজীব, *'শ্রীকৃষ্ণকৌতুকম্'*, প্রিন্টার্স ওঙ্কার, বারুইপুর। (বঙ্গানুবাদ)

[৭৮] ন্যায়তীর্থ, শ্রীজীব, *'শ্রীকৃষ্ণকৌতুকম্'*, *'সংস্কৃত প্রতিভা'*, সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লীঃ ১৯৬৯ ।

[৭৯] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব, *'নষ্টহাসম্'*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৮৩ তম সম্ভার), কলকাতা: ১৯৯৮। পৃ. ৬৬-৮৪।

[৮০] তদেব।

[৮১] তদেব।

[৮২] তদেব।

[৮৩] তদেব।

[৮৪] তদেব।

[৮৫] তদেব।

[৮৬] তদেব।

[৮৭] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, *'স্তবকুসুমমালিকা'*, দেবীজীবন ভট্টাচার্য, শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফাঃ ১৩৯৩ (বঙ্গাব্দ)।

[৮৮] সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তক পত্রিকা, সম্ভার-৪৪, পৃ. ১।

[৮৯] *'শৃণ্বন্তু'* (সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন ১৩৫৯-১৪০৯), সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (সম্পা.), অরবিন্দ ভবন, কলকাতাঃ বৈশাখ, ১৩৯৭ (বঙ্গাব্দ)।

[৯০] সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সম্ভার ৪৬, পৃ.৩৪।

[৯১] তদেব, সম্ভার ৪৯, পৃ. ৬।

[৯২] শ্রীজীবের গৃহ থেকে গৃহীত।

[৯৩] তদেব, সম্ভার-৪৭, পৃ. ২৪৬।

[৯৪] সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সম্ভার ৫০, পৃ. ৯৭।

[৯৫] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *'শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটকচর্বণম্'*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতাঃ ২০১৮, পৃ. ৪৯।

[৯৬] দ.দু., উৎসর্গপত্রে।

[৯৭] তদেব।

[৯৮] বিজন কুমার মহাশয় (১৫.৮.১৮৯১-১.২.১৯৫৬) ছিলেন স্বাধীন ভারতের চতুর্থ প্রধান বিচারপতি এবং প্রথম বঙ্গসন্তান যিনি এই পদলংকৃত করেছেন। তিনি একাধারে ইতিহাসবিদ্, সংস্কৃতজ্ঞ ও আইন প্রতিপালক ছিলেন। নবদ্বীপের ভূমিপুত্র বিজনবাবু *'The Hindu Law of Religious and Charitable Trusts'* নামে একটি বই রচনা করেন। তাঁর আইন সম্পর্কিত গবেষণা *'Problems of Arial Law'* ছিল তৎকালীন সময় থেকে বহু এগিয়ে। নবদ্বীপের 'বঙ্গ বিবুধ জননী সভা' তাঁকে 'বিদ্যারঞ্জন' ও 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ফেলো' মনোনীত করে। তিনি 'বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি'র সভাপতি পদে আসীন ছিলেন।

[৯৯] সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৮তম সম্ভার, ১১ সংখ্যা/ মার্চ, ১৯৫৬।

[১০০] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতাঃ

[১০১] সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২৪তম সম্ভার, ৩ সংখ্যা/ জুলাই, ১৯৬২।

[১০২] তদেব, শ্লোক সংখ্যা ১। পৃ. ৮৬-৮৮।

[১০৩] সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২৪তম সম্ভার, ৯ সংখ্যা, ১৯৬৩।

[১০৪] লক্ষণ শাস্ত্রী জোশী (২৭.১.১৯০১-২৭.৫.১৯৯৪) একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, হিন্দু ধর্মের পোষক, মারাঠি সাহিত্য সমালোচক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন। জোশীজী সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারের প্রথম প্রাপক (১৯৫৫) । তিনি ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার দ্বারা 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৯২ সালে 'পদ্মবিভূষণ' -ভারতের দুটি সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

[১০৫] গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য একজন ভারতীয় পণ্ডিত, যিনি ভারতবিদ্যা (Indology) শাখার গবেষক ছিলেন। তিনি ভারতীয় দর্শন মূলত ন্যায়-বৈশেষিক ও নব্য-ন্যায়ের উপর কাজ করেছেন। 'প্রাচী জ্যোতি' নামক প্রকাশনা সংস্থার তিনি সম্পাদক ছিলেন।

[১০৬] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *'শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটকচর্বণম্',* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতাঃ ২০১৮, পৃ. ৪৫।

[১০৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭.৫.১৮৬১-৭.৮.১৯৪১) ছিলেন একজন বাঙালী কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব', 'বিশ্বকবি' ও 'কবিগুরু' নামেও আখ্যাত করা হয়ে থাকেন। ইনিই এশিয়া মহাদেশ সর্বপ্রথম সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার (১৯১৩) পেয়ে থাকেন।

[১০৮] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *'শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটকচর্বণম্',* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতাঃ ২০১৮, পৃ. ৫৪।

[১০৯] William Wordsworth (৭.৪.১৭৭০-২৩.৪.১৮৫০) ছিলেন একজন ইংরেজ কবি। ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক বা শৃঙ্গাররসের আগমন তাঁর হাত ধরেই হয়েছে। তাঁর অন্যতম সৃষ্টি- *'The Prelude'*।

[১১০] কাব্যটি ১৮০২ সালের আগষ্ট মাসে রচিত হলেও ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

[১১১] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *'শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটকচর্বণম্',* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতাঃ ২০১৮, পৃ. ৫৫।

[১১২] ভট্টাচার্য, শ্রীজীব এবং চর্তুবেদ শাস্ত্রী, *'প্রবচন পারিজাত',* পুষ্পেন্দু কুমার শর্মা, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠম্, দিল্লীঃ ১৯৭৬।